গল্পমাল্য

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং,
১৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

১৩২৪

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক
শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এস্-সি,
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গল্পমালা

শাপমুক্তি

(১)

াতিতে মুচি। ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকিত। ছেলে-পিলেও দুইটি তিনটি ছিল।

সাইমন বড় গরীব; রোজগার সে যাহা করে তাহা অতি সামান্য—কোনও রকমে টায়ে'-টায়ে' তাদের পেটের ভাতটাই চলে মাত্র। পরণের কাপড়ের কথা উঠিলেই মুস্কিল। সাইমন্ প্রতিবৎসর পেটে না খাইয়া কিছু কিছু করিয়া জমায়—শীতকালে একটি গরম আংরাখা কিনিবে বলিয়া, কিন্তু সেটা কোনও বৎসর আর ঘটিয়া উঠে না। সেই শততালিযুক্ত পুরানো থস্‌থসে দুর্গন্ধ জামাটাতেই বৎসরের পর বৎসর শীত কাটিয়া যাইতেছে।

এবার শীতের কিছু আগে হইতেই সে একটা গরম আংরাখা কিনিবার বন্দোবস্ত আরম্ভ করিল। যেমন করিয়া হোক্—কিনিবেই। তার নিজের কাছে কিছু

জমিয়াছিল, স্ত্রীর কাছেও তিন টাকা সাত পয়সা হইয়াছিল—আর খরিদ্দারদের কাছেও কিছু সে পাইবে। সুতরাং এবার আর গরম জামা না হইয়া যায় না।

আজ সকালেই সে আংরাখার জন্য কাপড় কিনিয়া আনিবে স্থির করিল। বেশ শীত পড়িয়াছিল। পত্নীর পরিত্যক্ত একটা ছেঁড়া জ্যাকেট, কোটের নীচে আঁটিয়া, একটা ডাল কাটিয়া একগাছা লাঠি তৈরি করিয়া লইয়া, সাইমন্ বাহির হইল। মনে মনে ঠিক করিল যে তার স্ত্রীর দরুণ তিন টাকা, আর তার খরিদ্দারদের কাছে যে সাড়েচারি টাকা পাওনা আছে, এই সাড়ে সাত টাকাতে তার খুব ভাল একটি জামা নিশ্চয়ই হইবে। যদি তারও উপর কিছু লাগে তো নিজের জমা হইতে দিবে।

সহরে আসিয়াই সাইমন্ প্রথমে তাহার একজন খরিদ্দারের বাড়ী গেল। গৃহস্বামী বাড়ী ছিলেন না। কর্ত্রীঠাকুরাণী জানাইলেন যে তাঁর স্বামী বাড়ী আসিলেই, তিনি তাঁহাকে আগে সাইমনের টাকা শোধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিবেন; এবং দু'এক দিনের মধ্যেই যাহাতে সাইমন্ তাহার প্রাপ্য টাকা পায়, তাহার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন। মাত্র দু'দিন সবুর করিতে হইবে, দুটি দিন মাত্র!

অন্য আর এক খরিদ্দারের বাড়ী গেল। সে শপথ করিয়া বলিল যে সে আজ কপর্দ্দক-শূন্য।

পথে এক জায়গায় একটা কায মিলিল। একজনের

জুতায় হাফ্‌সোল লাগাইয়া দিয়া সাইমন্ আট আনা পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করিল।

খরিদ্দারের কাছে বাকী আদায় হইল না বলিয়াও সাইমন্ দমিল না। ভাবিল—"কাপড়টা না হয় ধারেই কিনে নিয়ে যাই।"

দোকানী ধার দিল না। বলিল—"ফ্যালো কড়ি মাখো তেল—ধার ধোর বুঝি না বাবা! টাকা আদায় করতে কে তোমার দোরে রোজ রোজ ধন্না দেবে? তুমি কি জান না—বিলেৎ আদায় করা কত মুস্কিল?"

সাইমন্ ফিরিল, তার কাপড় কেনা আর হইল না। একজন একজোড়া বুট জুতা দিল, মেরামত করিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিতে হইবে। সাইমন্ সেই বুট জুতা-জোড়াটি ঢুলাইতে ঢুলাইতে বিষণ্ণ মনে বাড়ীর পথে ফিরিল। এত করিয়াও গরম জামা আর হইল না। একি কম আপশোশ্?

মনটা খুবই খারাপ। পথে আসিতে আসিতে একটা মদের দোকানে ঢুকিয়া সে সকাল বেলার উপার্জ্জিত আট আনার মদ খাইয়া, বাড়ীপানে চলিল। মনটা কতক ভাল হইল, বুকের বোঝাটাও অনেক পাত্‌লা হইয়া গেল, শীতবোধও কম হইতে লাগিল। সে খোস্-মেজাজে জোরে জোরে লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে, হাতের জুতা-জোড়াটি দোলাইতে দোলাইতে, আপন মনে চলিতে লাগিল।

"বাঃ—এই কোর্ত্তাতেই তো বেশ গরম হচ্ছে! তবে আর গরম কোর্ত্তার দরকার কি? কি হবে গরম কাপড়ে? ...কিসের অভাব আমার?...ভাবনাই বা কি?...আমি ত গরম জামা না কিনেও বেশ চালাতে পারি দেখ্‌চি!...দুঃখ কিসের?...না, না, দুঃখ আছে বৈ কি—ঐ বৌটা। ওটা সারাদিন ভারি খিট্‌ খিট্‌ করে! হয় তো বাড়ী গিয়ে দেখবো সে তোফা খেয়ে দেয়ে হেঁসেল তুলে বসে আছে। আমার জন্যে একটা দানাও ফেলে রাখেনি।"

—এমনি নানা রকম আবোল-তাবোল ভাবিতে ভাবিতে সাইমন্‌ একবারে গির্জ্জা ঘরের কোণের কাছে, যেখানে রাস্তাটা বাঁকিয়া গিয়াছে, সেই মোড়ের মাথায় আসিয়া হাজির।

হঠাৎ রাস্তা হইতে গির্জ্জার পিছনে তার নজর পড়িল। দেখিল একটা সাদা কি যেন বসিয়া আছে। বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল—ভাল করিয়া বোঝা গেল না, ঠিক ওটা কি!

"ওটা কি ওখানে?...সাদা পাথর তো ওখানে নেই?...তবে বুঝি গরু?...গরুই বা কি করে হবে?... মাথাটা দেখা যাচ্ছে যে ঠিক মানুষের মাথার মত!...মানুষ তবে ওখানে অমন করে বসে কি করচে?"

সাইমন্‌ দেখিবার জন্য গির্জ্জার ধারে সরিয়া গেল।... "ওমা, তাইত!...এ তো মানুষই বটে!...সত্যিই তো

মানুষ!...মানুষটা কি মরা, না জ্যান্ত?...গির্জ্জার দেওয়ালে একবারে হেলে পড়ে'—একি?"—সাইমন্ খুব বিস্মিত হইয়া সেই মনুষ্যটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

"হয়েছে, বুঝিচি—কেউ ও লোকটাকে মেরে, সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে পালিয়েছে! বোঝা গেছে—আর কাছে গিয়ে কাজ নেই বাবা! গেলেই এখুনি মহা মুস্কিল...সরে পড়াই ঠিক...আমি যেন ও-সব দেখিনি! সেই ভাল।"

—ভাবিয়াই সাইমন্ মোড় ফিরিল। খানিক দূরে গিয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল—লোকটাকে আর দেখা গেল না। না দেখিতে পাইয়া সে দ্বিগুণ কৌতূহলী হইয়া কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরে দেখে যে, সে লোকটা একটু সরিয়া বসিয়া, সাইমনের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

ভয়ে সাইমনের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। সে ভগবানের নাম জপিতে লাগিল। কিন্তু এখন কি করা যায়—এই তাহার প্রধান চিন্তা হইল। লোকটার কাছে যায়, না দৌড়িয়া পলায়?

ভাবিল—"যদি এখন ওর কাছে যাই, তাহলে তো দেখ্‌চি আর রক্ষা নাই! কে জানে বাবা, ও কেমন লোক। ও নিশ্চয়ই কোন বদ্‌মাইস্, তা নৈলে ওখানে অমন করে বসে থাকবে কেন? উঁহু, ভাল বোধ হচ্ছে না। হয় তো যেমনি আমি ওর কাছে যাব, অমনি ও আমার টুঁটিটা চেপে

ধর্‌বে। আমার টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত কর্‌বার আর সাধ্য থাক্‌বে না!...আর ধর, টুঁটি না-ই ধরলো। আমি ওখানে গিয়ে কি করব? ও ন্যাংটা। ওকে আমি কি করে এ অবস্থায় সাহায্য কর্‌তে পারি, বল? ওর উপকার কর্‌তে, আমি আমার এই সবেমাত্র সম্বল পোষাকটি তো আর দান কর্‌তে পারি নে! কি হবে তখন গিয়ে?"

সাইমন্ দ্রুতপদে বাড়ী পানেই ফিরিল। কিন্তু একটু যাইতে না যাইতেই আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কে যেন কহিল—

"এ কি সাইমন্! এ তুমি কচ্চ কি? ওখানে একটা লোক মরে যাচ্ছে, আর তুমি কেবল তোমার নিজের স্বার্থ-টুকুরই হিসেব কর্‌চ! তুমি কি এতই বড় লোক? তোমার কি কখনও কোন জিনিষ ক্ষয় হবে না, লোক্‌সান যাবে না? ছি, সাইমন্—এ তুমি ভাল কায কর্‌চ না!"

সাইমন্ ফিরিল, একবারে সোজা গির্জ্জা ঘরের কোণে সেই লোকটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাছে আসিয়া সাইমন্ দেখিল যে, ইহার বয়স নিতান্ত কম, বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধর কান্তি! কৈ গায়েও তো কোন রকম মা'র ধোর বা অস্ত্রাঘাতের দাগ নাই! তবে দেখিয়া মনে হইল, সে যেন শীতে কাঁপিতেছে, আর খুব ভয়ও পাইয়াছে!

সে যেমন দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল, তেমনি

অটল অবিচলিত হইয়া বসিয়াই রহিল। সাইমন্‌কে একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না। বোধ হইল —সে এত তুর্ব্বল যে চোখ মেলিয়া চাহিতেও যেন তার কষ্ট হইতেছিল।

সাইমন্ তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। মাথা তুলিয়া চোখ খুলিয়া সে সাইমনের মুখপানে একবার চাহিল।

যেমন চারি চক্ষের মিলন—অমনি এই লোকটির জন্য সাইমনের ভিতরটা এক অপূর্ব্ব করুণায় ভরিয়া উঠিল। সাইমন্ আর থাকিতে পারিল না। হস্তস্থিত বুট-জোড়াটি, নিজের ওয়েষ্ট কোট ও সেই পুরাণ গরম জামাটি হঠাৎ সেই অপরিচিতকে দিয়া বলিল—"নাও দিকিন্, এইগুলো পর'। পরে' আমার সঙ্গে চলে এস! নাও, নাও!"

এই বলিয়া সাইমন্ তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া পায়ের উপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল। সাইমন্ সেই স্বল্প অবসরে তাহার সুগঠিত দেহ, শুভ্র বর্ণ, এবং করুণ মুখখানি দেখিয়া মনে মনে খুবই পুলকিত হইল; তার বুকের মধ্যেও স্নেহের বান ডাকিয়া উঠিল। সে এত তুর্ব্বল যে জামার মধ্যে হাত ঢুকাইবার বল পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। সাইমন্ তাহাকে জামা পরাইয়া,

বোতাম আঁটিয়া দিয়া, নতজানু হইয়া সেই জুতাজোড়াটি পায়ে চড়াইয়া দিয়া, সস্নেহে বলিল—"ব্যস্, এইবার এসো ভাই।...চল্‌তে পার্‌বে না? আচ্ছা, আস্তে আস্তে একটু চলে' রক্তটা একবার গরম করে নাও দিকিন, তা হলেই হবেখ'ন্।"

নিজের মাথার ময়লা ছেঁড়া টুপিটাও এই লোকটির মাথায় পরাইয়া দিবার জন্য খুলিয়া ভাবিল—"না, এ ছেঁড়া টুপি আর ওরকম কালো কালো বাবুড়ি চুলের ওপর চাপিয়ে কায নেই। এ আমার মাথাতেই থাক্।"

অপরিচিত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার সাইমনের পানে কাতরদৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলে নাই।

"কি গো তুমি কি বোবা? কথা বল্‌চ না যে। তা মরুক্ গে, যা হোগগে—এখন চল বাড়ী যাই—এখানে তো এই শীতে রাত্রিবাস করা যাবে না!—তা যদি বেশী দুর্ব্বল বলে' বোধ কর তো আমার এই লাঠি গাছটাই নাও না হয়, এতে ভর দিয়ে এস! এখানে তো আর দাঁড়ানো যায় না। চল!"

—বলিয়াই সাইমন্ পা বাড়াইল। অপরিচিতও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর, তুমি আস্‌চ কোথা থেকে?"

"অনেক দূর থেকে।"

"তা তো বুঝতেই পারচি! এর আশপাশের সব গাঁয়ে আমার তো আর কেউ অচেনা নেই! তা, তুমি ও গির্জ্জা-ঘরের পিছনে এসে পড়লে কি করে?"

"সেটা বলতে পারব না।"

"কেউ কি তোমায় মেরেচে?"

"না, কেউ মারেনি। ভগবান্ আমায় মেরেচেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—তা তো বুঝতেই পারচি। ভগবানই তো যত নষ্টের জড়! তবু কোনও একটা বিশেষ জায়গা হতে তো তুমি আসচো? না, তা-ও না? আর যাবেই বা কোথা?"

"যেখানে হয়—যাবারও আমার কোনও স্থিরতা নেই।"

এ উত্তরে সাইমন্ চমকিয়া উঠিল।—ভাবিল—"জোচ্চোর বলেও তো বোধ হচ্চে না। গলার আওয়াজ যার এত মিঠে, সে কি কখনও প্রতারণা করতে পারে? ...তবে এ কোন কথা খোলাশা করে বলে না কেন? এ কি অদ্ভুত জীব?"

সাইমন্ ঠিক করিল—হয় তো জীবনের এ সব গোপন কথা ইহার কাহাকেও বলিবার ইচ্ছা নাই।

"বেশ—তা চল এখন আমার সঙ্গে আমার বাড়ী! শীতের হাত হতে তো আগে নিস্তার পাও—তারপর সে পরের কথা পরে হবে।"—বলিয়া এই নবীন সাথীটির পাশে পাশে সাইমন্ চলিতে লাগিল।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস সাইমনের কামিজ ফুঁড়িয়া তাহার হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত জমাইয়া দিতেছিল। সরাব যেটুকু খাইয়াছিল, তাহার নেশা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। কাযেই ঠাণ্ডাটা সাইমনের তীব্রতর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

..."খুব কায করলাম যা হোক্! শীতের জন্যে গরম কোর্ত্তা করা'তে বাড়ী হতে বের হয়ে, যা-ও একমাত্র একটা কোট সম্বল ছিল, খয়রাৎ করে, একটা উলঙ্গ রাস্তার লোক ধরে' নিয়ে বাড়ী ফির্‌চি! বাহবা, বাহবা!...মাত্রিনা কিন্তু এতে নিশ্চয়ই খুসী হবে না।...সে তো এই দেখে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌বে। তা বুঝ্‌তেইপারচি।"

—স্ত্রীর কথা মনে পড়াতেই সাইমন্ যেন পাঁচ হাত দমিয়া গেল: কাতর নয়নে একবার সাথীটির পানে চাহিল, গির্জ্জাপ্রাঙ্গণের সেই চারি চক্ষের মিলন মনে পড়িল। অমনি সাইমনের হৃৎপিণ্ড এক অপূর্ব্ব অহেতুকী পুলক-প্রীতিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

(২)

সাইমনের স্ত্রীর কাযকর্ম্ম সেদিন খুব সকাল সকালই সারা হইয়া গিয়াছিল। দুই বাল্‌তি জল তুলিয়া রাখিয়া, আগুন জ্বালাইবার জন্য কাঠ কিছু কাটিয়া, ছেলেপিলে-গুলিকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া, মুচিনী ভাবিল—"রান্না কর্‌ব নাকি?...নাঃ, আর পারি নে শরীরটা বড় এ'লে

পড়েছে...সে নিশ্চয় খেয়েই আস্‌বে...এই একখান রুটি থাক্‌লো মোটে কাল সকালবেলাকার জন্যে...এতে কাল হবে না?...সকালবেলা কি?...কাল সারাদিনই তো যাবে...মস্ত রুটি যে? ঘরে ময়দাও কিছু আছে, এতেই শুক্রবার পর্য্যন্ত চলে যাবে কোনও রকমে।”

এই রকম ভাবিতে ভাবিতে ঘরকন্না সারিয়া, মাত্রিনা সাইমনের একটা জীর্ণ কামিজে তালি লাগাইতে বসিয়া গেল। সেলাই করে আর ভাবে...“না জানি কেমন কাপড়ই বা সে কিনে আন্‌চে! ভগবান্ করুন, এখন ঠকে না এলে বাঁচি! আহা সে বড় ভালমানুষ,...একটা পাঁচ বছরের ছেলেও যে তাকে ঠকাতে পারে। তাকে ঠকান কি শক্ত? সাড়ে সাতটা টাকা—নিতান্ত অল্প কথা তো নয়, সাড়ে সাত টাকা! আহা বেচারী শীতে কি কম কষ্টটা পাচ্ছে? আমার ছেঁড়া জ্যাকেটটা আবার গায়ে দিয়ে গেছে!—এখন আমি বেরোই কি করে? বোকা, অতি বোকা—কি কচ্চে সে সারাদিন? এখনো যে ফেরে না।”

সাইমনের পদশব্দ শোনা গেল। মাত্রিনা হাতের সেলাই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। দেখিল সাইমন্ একা আসে নাই, আর একজন কাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। তার মাথায় টুপি নাই, অথচ পায়ে ভাল একজোড়া বুট।

মাত্রিনা বুঝিল, তাহার স্বামী খুব মদ খাইয়া আসিয়াছে। অদ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলিল—"ঠিক, যা ভেবেচি!"

তারপর খানিকক্ষণ চাহিয়া যখন মাত্রিনা দেখিল যে নূতন জামা করানো তো দূরের কথা সাইমনের গায়ে তার নিজের সে কোর্ত্তাটা পর্য্যন্ত নাই, তখন তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

—"দেখ দেখি, দেখ দেখি একবার হতভাগা মিন্সের কাণ্ড! রাস্তার লোকের সঙ্গে বসে সারাদিন মদ মেরেছে—আবার তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এসেচে! এখনো আশা মেটে নি?"

কি করে? মাত্রিনা উভয়কেই পথ ছাড়িয়া বাড়ী ঢুকতে ইশারা করিল, কোন কথা বলিল না। কিয়ৎক্ষণ সে এই মলিন কৃশ আগন্তুকের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল, ইহার গায়ে কামিজ পর্য্যন্ত নাই। আগন্তুক মাটির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অটল নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া মাত্রিনা সিদ্ধান্ত করিল—ইহারা কিছু একটা গুরুতর গোছের করিয়া আসিয়াছে তার আর ভুল নাই—তাই ভয় পাইয়াছে!

মাত্রিনা মুখ ভার করিয়া, রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে ষ্টোভের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল—দেখি কি করে এরা!

সাইমনের মুখটি চূণ! সে অপরাধী ছাত্রের মত গুরুমহাশয়ের সম্মুখে আসন্ন বিপদাশঙ্কায় সম্মুখের বেঞ্চি-খানায় গিয়া আস্তে আস্তে বসিয়া বলিল—"বলি, দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ কি? দুটো খেতে টেতে দেবে? ক্ষিধেয় যে প্রাণ বেরিয়ে গেল!"

পত্নী দাঁত কড়্‌মড়্ করিতে করিতে কি বলিল, তাহা সাইমন্ বুঝিতে পারিল না। মাত্রিনা যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই একবার ইহার একবার উহার মুখপানে কটমট করিয়া চাহিতে লাগিল।

এ দৃষ্টির অর্থ সাইমন্ বিলক্ষণই বুঝিল। কিন্তু কি করে?—তাহার যে উভয় সঙ্কট! যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবটা দেখাইয়া, আগন্তুকের হাতটি ধরিয়া কাছপানে টানিয়া বসাইয়া বলিল—"বোস', ভাই বোস'—দাঁড়িয়ে রইলে যে? কিছু খাও!"

আগন্তুক নীরবে সেই কাষ্ঠাসনে বসিল।

"বলি, ও—গো! আজ কি আর রান্নাবান্না কিছু হয় নি না কি?"

এইবার ঝড় উঠিল।

—"রান্না হবে না কেন? রান্না হয়েছে বৈ কি। কিন্তু সে তোমার জন্যে হয় নি। আ মর্ ডেক্‌রা! শুধু তো মদ খেয়ে এসো নি, নিজের বুদ্ধি সুদ্ধি পর্য্যন্ত খেয়ে এসেচ! কথা শোন' একবার হতভাগার! মরণ নেই?

শীতের জন্যে গরম কাপড় কিনতে বেরিয়ে, যা'ও একটা পুরোণো ধুরোনো জামা ছিল সেটাও বিলিয়ে দিয়ে—রাস্তা থেকে এক ন্যাংটা মাতালকে এনে ঘর ঢুকিয়ে, কোন্ মুখে খেতে চাইচিস্? আ মরণ খালভরা! বল্‌তে লজ্জা করে না? মাতাল কাতালদের জন্যে এখানে খাবার টাবার নেই।"

"দেখ, সাবধান হয়ে কথা বোলো,—ভাল হবে না, বলে রাখ্‌চি!—জান এ লোকটি কে?"

"রেখে দিগে তোর লোকটি কে! আগে আমার টাকা কি কর্‌লি বল্!"

সাইমন্ তাহার পেণ্টলনের পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া ঠং ঠং ঠং করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"ঐ নে তোর টাকা! কাপড় কেনা হলো না! খদ্দেররা আজ কেউ টাকা দিতে পার্‌লে না!"

ইহাতেও মাত্রিনার রাগ পড়িল না। সে কেন তাহার একমাত্র পুঁজি এই জামাটি এই লোকটাকে দিল? আর পাওনা টাকা, তাই বা আদায় না হইবে কেন? পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে কি আর টাকা উশুল্ হইত না?

মাত্রিনা টাকা তিনটা কুড়াইয়া লইয়া বাক্সে রাখিতে রাখিতে রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল—"বেশ কথা! তা খাবার টাবার এখানে কিছু নেই। তুমি যে মনে কর্‌চ যে রাস্তার মাতাল ধরে ধরে এনে বাড়ীতে পুর্‌বে,

আর আমি তাদিকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াব—সেটি হচ্চে না! লোক দেখ্‌লেই চেনা যায় কে কেমন লোক। ভাল লোকই এ যদি হবে, তা হলে কি আর এমনি ন্যাংটা হয়ে পথে পথে বেড়ায়? আমি কি আর তোমার এসব চালাকি বুঝি না মনে করেচ?—কে এ?"

"সেই কথাই তো বল্‌চি! একটু স্থির না হলে কি মাথামুণ্ডু শুন্‌বে? আমি গির্জ্জে ঘরের পাশ দিয়ে আস্‌ছিলাম, দেখি যে এই লোকটি সেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একবারে উলঙ্গ অবস্থায়, এই দারুণ শীতে মর-মর। —আমি যদি একে না দেখ্‌তাম তো এই রাত্রেই যে এ মরে যেত!—ভগবান্ আমাকে এর কাছে যেতে বল্লেন! আমি গেলাম! যা' পারলাম, নিজের পোষাক খুলে একে দিলাম, দিয়ে এখন বাড়ী নিয়ে এসেচি।—নৈলে যে লোকটা বেঘোরে মরছিল।—বুঝ্‌লে? একটু ঠাণ্ডা হও, মাত্রিনা, একটু ধীর হও। চব্বিশ ঘণ্টা অমন রণচণ্ডী হয়ে, ফাল্ হয়ে থেকো না! রাগ্‌তে নেই, রাগা পাপ! আমরা সবাই একদিন মর্‌বো—এটা যেন মনে থাকে।"

মাত্রিনা কি বলিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

অপরিচিতের পানে সে আর একবার চহিল। দেখিল সে হাঁটুর উপর হাত দুটি যোড় করিয়া, নত-নয়নে ঠিক সেইভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এইবার মাত্রিনা একটু নরম হইল।

সাইমন্ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বুক থেকে দয়া মায়া কি ভগবান্ একেবারে কেড়ে নিয়েছেন, মাত্রিনা?"

মাত্রিনা কোনও উত্তর করিল না। সে একদৃষ্টে সেই নবাগত লোকটির পানেই চাহিয়া রহিল। অতিথি হঠাৎ মাথা তুলিয়া মাত্রিনার পানে চাহিল। মাত্রিনার হৃদয় স্নেহ করুণায় এবং অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। সেখানে আর সে দাড়াইতে পারিল না। একটি শব্দ পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না। আস্তে আস্তে মাত্রিনা গিয়া উনান জ্বালাইল এবং আহারের বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

অত্যল্পকাল মধ্যেই মাত্রিনা রন্ধনাদি করিয়া, খাবার পরিবেষণ করিয়া ডাকিল—"এস খাবে এস।"—কণ্ঠস্বর এবার কোমল স্নেহার্দ্র এবং অনুতপ্ত।

"এস ভাই, খাই গে, এস"—বলিয়া সাইমন্ অতিথিকে লইয়া গিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

মাত্রিনা উভয়ের সম্মুখে বসিল। তাহার চক্ষু সেই হইতে এই সুকুমার কিশোর অতিথিকে ছাড়িয়া আর কোথাও ফিরিতে চাহিতেছিল না।

মাত্রিনার সমস্ত মাতৃস্নেহ এই হতভাগ্য সুন্দর মৌন কিশোরটিকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

অতিথির চিন্তা-তমসাচ্ছন্ন বিমর্ষ মুখমণ্ডলে একটা প্রফুল্লতার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে মাথাটি তুলিয়া মাত্রিনার মুখের দিকে চাহিয়া একবার একটু হাসিল।

ভোজন শেষ হইলে, মাত্রিনা একটু পূর্ব্বে সাইমনের যে কামিজটিতে তালি লাগাইতেছিল সেইটি এবং সিন্দুক খুলিয়া একটা পুরাতন পেণ্টুলন্ আনিয়া অতিথিকে দিয়া বলিল—"এই দুটো তুমি পর। তোমার কাপড় চোপড় তো কিছুই নেই! আপাততঃ এইতেই কায চালাও।—আর রাত্রে, এই বেঞ্চিতে সুবিধা হয় এখানেই, কিম্বা যদি গরম চাও তো রান্নাঘরে, যেখানে তোমার ইচ্ছে সেইখানেই শুয়ো। কেমন? এইবার তবে আমি যাই, শুইগে?"

অতিথি সেই কামিজ গায়ে দিয়া পায়জামাটি পরিয়া সাইমনের দেওয়া কোর্ত্তাটি খুলিয়া মাটিতে রাখিয়া নীরবে সেই বেঞ্চির উপরেই শুইয়া পড়িল। মাত্রিনা কোর্ত্তাটি উঠাইয়া বাতিটি নিবাইয়া দিয়া শয়ন করিতে গেল।

মাত্রিনা সেই কোর্ত্তাটি মুড়ি দিয়া শুইল; কিন্তু ঘুম আর আসে না। কেবল বারে বারে এই নবাগতের তরুণ ঢল ঢল মুখখানিই মনে পড়ে! সে চিন্তা যদি যায় তো ভাবে, কাল সকালে আহারের কি হইবে? যাহা ছিল সব যে খরচ হইয়া গেল। ময়দা আছে, তাই দিয়া না হয় আবার সে রুটিই তৈরি করিবে। কিন্তু এ সে কি করিল?

সাইমনের বহু কষ্টের সেই তোলা পায়জামাটা আর কামিজটা —কামিজটা না হয় একটু পুরানোই হইয়াছিল—একবারে এই কোথাকার-কে-লোকটাকে দিয়া ফেলিল? ছি ছি ছি —এটা সে অত্যন্ত খারাপ কায করিয়াছে। এখন উপায়? মাত্রিনার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সেই তরুণ ঢল ঢল করুণ মুখখানি, সেই একটু সরল হাসি, সেই একান্ত নির্ভরের স্নিগ্ধ চাহনি!—মাত্রিনার হৃদয় অনুকম্পায় আনন্দে পুলকে স্নেহে ভরপূর হইয়া পড়িল!

প্রাতে উঠিয়া সাইমন্ দেখিল, তাহার স্ত্রী পাড়ায় কিছু ময়দা ধার করিতে বাহির হইয়াছে, ছেলেপিলেগুলি তখনও ঘুমাইতেছে, আর সে নবাগত একাকী তেমনি বিমর্ষ মুখটি নীচু করিয়া বেঞ্চিখানির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতেছে। তবে মোটের উপর কালকের চেয়ে আজ যেন তার মুখমণ্ডল সামান্য একটু— অতি সামান্য—প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইল।

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর—তুমি কি কায করতে পার বল দেখি? খেতে পরতে হবে তো—তার কোনও একটা উপায় করতে হবে তো?

"আমি যে কোন কাযই করতে পারি নে।"

"অ্যাঁঃ"—বলিয়া সাইমন একবারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, —"সেকি? মানুষের অসাধ্য কায আছে? সে যদি মনে

করে যে আমি অমুক কায কর্‌ব,—তা হ'লে তাকে ঠেকায় কে ?"

"বেশ, তবে আমিও কর্‌ব। সবাই যখন করে, তখন আমিই বা না কর্‌ব কেন ?"

"বেশ ! খুব ভাল কথা।—আচ্ছা তোমার নামটি কি ?"

"মিচেল।"

"আচ্ছা মিচেল, তুমি তোমার পরিচয় তো কিছুই আমায় দিলে না ? তা যদি কোন আপত্তি থাকে, দিও না। কিন্তু তুমি আমার কথা যদি বরাবর শোন তো তোমার সমস্ত ভার আমি নিই।"

"নিশ্চয় শুন্‌ব। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন্। আমায় কি কায কর্‌তে হবে, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও—আমি তাই কর্‌ব।"

সাইমন্ খানিকটা সেলাইকরা সূতা আনিয়া মিচেলকে দিয়া, বুঝাইয়া দিল কেমন করিয়া সূতা পাক্ দিয়া কাঠিমে জড়াইতে হয়। তারপর কি করিয়া জুতার মাপ লইতে হয়, কেমন করিয়া চামড়া কাটিতে হয়, কি ভাবে ফর্ম্মা চড়াইতে হয়, সোল নির্ম্মাণের কারিগরী কোথায়, কি করিয়া তালি লাগাইতে হয়—ইত্যাদি বিষয়ে সাইমন্ মিচেলকে তালিম দিতে লাগিল।

দুইদিন পরেই সাইমন্ দেখিল যে, মিচেলকে কোন কায এক বার বুঝাইয়া দিলে দ্বিতীয় বার আর সে কায

দেখিতে পর্য্যন্ত হয় না। তা ছাড়া, এত শীঘ্র এবং সহজে সে কায করিতে লাগিল, যেন চিরজীবন সে কেবল এই মুচির কাযই করিয়া আসিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত কখনও সে কামাই করিত না। খাইতও খুব কম—ইহাতে সাইমন্ তাহার উপর বেশ সন্তুষ্টই হইল। যখন সে কোনও কায করিত না, তখন ঘরের কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কথা এত কম বলিত যে তাহাকে বাড়ীর সকলে এক রকম বোবাই ঠাওরাইয়া ছিল। ঘরের বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া অথবা বিনা কাযে এখানে ওখানে ঘোরার বালাইও তাহার ছিল না। কায হাতে না থাকিলে সে গম্ভীর ও বিমর্ষ হইয়া উপর পানে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহাকে হাসিতে পর্য্যন্ত কখনও দেখা যায় নাই; কেবল প্রথম দিন যখন মাত্রিনা তাহাদিগকে খাওয়াইতেছিল, সেই সময় কেবল সে একবার ঈষৎ একটু হাসিয়াছিল মাত্র। তারপর তাহার মুখে আজ পর্য্যন্ত আর কেহ কখনও হাসি দেখে নাই।

এক বৎসর চলিয়া গেল। মিচেল সাইমনের কায করিয়া দেয়, তাহার সঙ্গে থাকে। ক্রমে দেখা গেল, এই অল্পদিনের মধ্যেই সাইমন্ একজন নামজাদা মুচি হইয়া উঠিল। তার তৈরি জুতা দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি টেঁকসই। সাইমনের যশ গ্রামের চারিদিকে প্রায় দশ বার ক্রোশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। বেশ দু'পয়সা পাইতেও লাগিল।

শীতকাল। সাইমন্ ও মিচেল উভয়েই কাযে খুব ব্যস্ত। এমন সময়ে দর্ দর্ করিয়া ভাল একখানি চক্‌চকে জুড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। গাড়ী থামিবামাত্র সহিস ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া দিল।

বহুমূল্য পরিচ্ছদে আবৃত একজন ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিলেন। বিনা বাক্যে পৈঁঠা তিনটি পার হইয়া তিনি একবারে সাইমনের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মাত্রিনা সসম্ভ্রমে দুয়ার দুইপাট ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আগন্তুক মাথাটি নত করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সোজা হইয়া যখন তিনি দাঁড়াইলেন, মনে হইল যেন তাঁহার মাথা ঘরের ছাদ স্পর্শ করিতেছে। সেই ক্ষুদ্র কুটীরটি তাঁহার বিশালায়তন দেহখানিতে একবারে যেন ভরিয়া গেল।

সাইমন্ একবারে থতমত খাইয়া আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল। এ রকম লোক সে ইতিপূর্ব্বে বড় একটা কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। সাইমন্ নিজে ছিল খুব বেঁটে কিন্তু এদিকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মিচেল, সে বড় ক্ষীণ ও কৃশ। মাত্রিনা তো যেন এক আঁঠি শুকনো কাঠ। সাধারণ মনুষ্য হইতে এই আগন্তুকটির দেহায়তনে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যাহা কি তাহা সঠিক না জানিলেও, দর্শন মাত্রেই একটা অকারণ সম্ভ্রমের উদ্রেক করিয়া দেয়।

লোকটি খুব জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন। সম্মুখ-স্থিত বেঞ্চের উপর কোটটি খুলিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন—"তোদের দু'জনের মধ্যে কারিগর কে রে ?"

সাইমন্ একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"আজ্ঞে আমি, হুজুর।"

আগন্তুক তাঁহার ভৃত্যকে আদেশ করিলেন—"ফেড্‌কা, চাম্‌ড়াটা নিয়ে আয়।"

ভৃত্য একটি পুলিন্দা আনিয়া পার্শ্বস্থ টেবিলে রাখিল।

"খুলে ফেল্ দিকিন্।

"এই যে চামড়াটা দেখ্‌চিস্"—বলিয়া ভদ্রলোকটি সাইমন্‌কে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

"হুজুর—"

"আচ্ছা, বল্‌তে পারিস্ এ কেমন চাম্‌ড়া ?"

সাইমন্ খুব মনোযোগ করিয়া চাম্‌ড়াটি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল—"এ খুব সেরা চাম্‌ড়া, হুজুর! খুব ভাল চাম্‌ড়া!"

"কেমন, খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে তো ?...সত্যি সত্যিই এ খুব ভাল চাম্‌ড়া! এমন চাম্‌ড়া হয়ত তুই জীবনে কখ্‌নো দেখিস্‌ই নি! এই টুকুর দাম পনের টাকা!"

সাইমন্ বিস্মিত হইয়া আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—"আমরা এমন মাল কোথায় আর দেখ্‌বো, হুজুর! আমরা গরীব—"

"হাঁ, তা' ঠিক, ঠিক। এখন এই চাম্ড়াতে আমার একজোড়া বুটজুতো কর্তে হবে, পার্বি ?"

"কেন পার্ব না হুজুর ? নিশ্চয় পার্বো।"

"নিশ্চয় পার্বি ? তা বেশ ! কিন্তু মনে থাকে যেন কি চাম্ড়ায়, কার জুতোর ফরমাস !...জুতো আমার পূরো একটি বছর যাওয়া চাই। এক বছরের মধ্যে যেন এতে কিছু কর্তে না হয়। বুঝ্লি ? পূরো এক বছর যাওয়া চাই। যদি বুঝিস্ যে পার্বি, তবে নে চাম্ড়া কাট্—নৈলে আমায় সাফ্ জবাব দে যে পার্ব না।...আমি এখন থেকেই বলে রাখ্চি যে, এক বছরের মধ্যে আমার জুতোর যদি কোন কিছু খারাপ হয়, তো তোকে জেলে দেব। আর যদি বেশ টেকে, বছর বাদে আমি তোকে এর দশ টাকা মজুরী দেব।"

এই লম্বা বক্তৃতা শুনিয়া সাইমন্ একটু দমিয়া গেল। কি যে উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না। মিচেলের পানে একবার তাকাইল, তাহাকে কনুই'য়ের এক খোঁচা দিয়া, এ ফর্মাস লইবে কিনা ইশারায় জিজ্ঞাসা করিল।

মিচেল ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

সাইমন্ আগন্তুককে জানাইল যে সে এ প্রস্তাবে রাজি। এক বৎসর তাহার তৈরি জুতার কিছুই হইবে না। দেখিতেও ঠিক নূতনের মতই থাকিবে।

অভ্যাগত তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিয়া, পা উঠাইয়া দিতে

আদেশ করিয়া বলিলেন—"বেশ কথা! তবে এখন মাপ নাও!"

এত বড় পা সাইমন্ ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখে নাই। দুইখানি কাগজে পায়ের ভিতর ও বাহির ছকিয়া লইয়া সাইমন্ মাপ শেষ করিল। এই সময়টা আগন্তুক মিচেলের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সাইমনকে জিজ্ঞাসা করিল—

"ঐ যে কায কর্‌চে—ও কে?"

"ও আমার কর্ম্মচারী, হুজুর। আপনার জুতো ঐ-ই বানাবে।"

গ্রাহক মহাশয় মিচেলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মনে রেখ এক বছরের মধ্যে আমার জুতোয় যেন হাত না লাগাতে হয়।"

সাইমন্ দেখিল যে মিচেল আগন্তুকের মুখপানে না চাহিয়া, তাঁহার মাথার উপর একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সেখানে বিশেষ দেখিবার মত সে যেন কিছু পাইয়াছে। কিছুক্ষণ ঐরূপে তাকাইয়া থাকিয়া মিচেল এই অপরিচিতের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে, হঠাৎ ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

খরিদ্দার মহাশয় মুচির কর্ম্মচারীর হাসিতে বিষম চটিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"হাস্‌চিস্ কি দেখে রে,

হতভাগা? হাসি কিসের? যে কায নিলি, সে কায কি করে তামিল কর্‌বি—তাই আগে ঠাওরা।”

মিচেল বিনয়-নম্র স্বরে উত্তর করিল—“যে সময়ে দেওয়ার কথা, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই আপনার জুতো পেলেই ত হল মশায়? তা’ পাবেন।”

আগন্তুক ওভারকোটটি গায়ে দিতে দিতে বলিলেন—“হাঁ, তাই যেন মনে থাকে।”

তিনি ফিরিলেন। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার সময় এবার মাথাটি নোয়াইতে ভুলিয়া গেলেন। ফলে, দুয়ারের চৌকাঠে কপালে এক বিষম ধাক্কা লাগিয়া গেল। আহত স্থানটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, গৃহস্বামীকে গালি দিতে দিতে তিনি বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

যেমন তিনি চলিয়া গেলেন, সাইমন্ অমনি কহিল—“বাপ্, মানুষ বটে! খুব শক্ত লোক, যা’হোক্! এখনি আমার চৌকাঠখানাই ভেঙ্গে গেছিল আর কি? ওর কপালের আর এতে কি হবে?”

মাত্রিনা কহিল—“লোকটা যেন কেমন ধরণের! সুবিধের নয়!...যেন লোহায় তৈরি···মরণও যেন ওর কাছে আস্‌তে ভয় করে!”

(৪)

“তার পর, হাঁ ভাই মিচেল, ফরমাস্ তো নেওয়া গেল;

কোনও বিপদে টিপদে পড়্‌বো না তো ? এই নাও চাম্‌ড়াটা —আর এই নাও পায়ের মাপ। ভাল করে বেশ হুঁশিয়ারির সঙ্গে কেটো ছেঁটো, ভাই। চাম্‌ড়াটা খুব দামী—আর ও লোকটাও তেমন ভাল নয়! এ কাযটা একটু সাবধান হয়ে কোরো। তা, তোমার নজরও ভাল, বুদ্ধি সুদ্ধিও ভাল, কায কর্ম্ম তো বেশ ভালই শিখেচ। তোমায় আর বেশী কি বল্‌ব ? এটা এখনি আরম্ভ করে ফেল তুমি। আমি আমার হাতের কাযগুলো সেরে ফেলি।”

মিচেল কায করিতে বসিয়া গেল। চাম্‌ড়াটা খুলিয়া সে কাটিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মাত্রিনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। বহুদিন হইতে কাটা ছাঁটা সেলাইয়ের কায দেখিয়া দেখিয়া সে প্রায় সমস্তই শিখিয়া ফেলিয়াছিল। যে ভাবে বুটজুতার জন্য চাম্‌ড়া কাটিতে হয়, সে রকম না করিয়া অন্য রকম করিয়া মিচেল চাম্‌ড়াটি কাটিয়া ফেলিল দেখিয়া মাত্রিনা অবাক্ হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ মিচেলকে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সাম্‌লাইয়া লইল। ভাবিল—“হয়ত আমিই ভুল বুঝেচি! লোকটা বোধ হয় মামুলি বুটের ফর্‌মাস দেয় নি! অন্য কোন রকমের কাট বলে দিয়ে থাক্‌বে!...মিচেল আমার চেয়ে ভালই বোঝে! কায কি আমার এতে কোন কথা বলে ?”

মাত্রিনা কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে মিচেল সেই চাম্‌ড়া হইতে একজোড়া 'বাধা' (Sandals) তৈরি করিয়া ফেলিল।

খাইবার সময় সাইমন্ আসিয়া দেখে যে মিচেল বুট না করিয়া একজোড়া 'বাধা' তৈরি করিয়া বসিয়া আছে! সাইমনের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দুঃখে ও ভয়ে তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল।..."অ্যাঁ, শেষে মিচেল—যে কখনো এতটুকু চুক্ করেনি—তার এই কায?"...আর সাইমন্ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল—"এ কর্‌লে কি, মিচেল? এখন আমি সে ভদ্রলোককে কি বলে' জবাব দিই? চাম্‌ড়াটাও তো গেছে একেবারে দেখছি! এখন উপায়? এ চাম্‌ড়া তো অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না!...এখন কি করি?...আজ তোমার হয়েছে কি? ছি ছি ছি ছি! এইবার আমায় তুমি মজালে, দেখচি!...তিনি বুট জুতোর ফর্‌মাস দিয়ে গেলেন, তুমি 'বাধা' তৈরি কর্‌লে কোন্ খেয়ালে?..."

দুয়ারে ঘন ঘন করশব্দ শ্রুত হইল। জানালার ফাঁক দিয়া তাহারা দেখিল একজন পাইক, তাহাদের দুয়ারের কড়ায় ঘোড়া বাঁধিতেছে।

সাইমন্ তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া দিতে গেল। পাইক হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"আদাব মিস্ত্রি ভাই।"

"আদাব। কি চাই?"

"আমাদের গিন্নি-মা আমায় সেই বুটের জন্য পাঠালেন।"

"বুট? কোন্ বুট্?"

"কর্ত্তার সে বুটের আর দরকার নেই। বুট পরা' তাঁব হয়ে গেছে।"

"কার? কি?...আমি কিছু বুঝ্তে পার্‌চিনে! কি বল্‌চ স্পষ্ট করে' বল।"

"কর্ত্তা পথে গাড়ীতেই মারা গেছেন। বাড়ী পৌঁচে গাড়ীর দরজা খুলে যখন আমি দাড়ালান, দেখি যে তিনি গাড়ীর ভিতর মরে' কাঠ হয়ে বসে আছেন। তখন সবাই মিলে তাঁকে ধরাধরি করে নামালাম। তাই গিন্নী-মা বলে' পাঠালেন মুচিকে গিয়ে বলগে যে বুট আর কর্‌বার দরকার নাই, সেই চাম্‌ড়ায় একজোড়া কবরের জন্যে 'বাধা' তৈরি কর্‌তে হবে। তুমি সেখানে বসে থেকে যত শীগ্‌গির পার 'বাধা'-জোড়াটি করিয়ে নিয়ে তবে আস্‌বে। আনা চাই-ই।"

মিচেল সদ্য প্রস্তুত 'বাধা' জোড়াটি ও উদ্বৃত চাম্‌ড়া-টুকু একটি কাগজে মুড়িয়া ছোট খাট একটি পুলিন্দা বাঁধিয়া আনিয়া পাইকের হাতে দিল। পাইক পাইবামাত্রই "আদাব, ভাই, আদাব আদাব"—বলিয়া তাড়াতাড়ি তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

(৫)

মিচেল আজ ছয়বৎসর হইল সাইমনের পরিবারভুক্ত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত মিচেল কখনও ঘরের বাহিরে যায় না। খুব কম কথা বলে। যেমন দিন যাইতেছিল তেমনিই দিন কাটিতেছে। কেবল দুইবার মাত্র সাইমনেরা মিচেলকে সামান্য একটু হাসিতে দেখিয়াছে। প্রথম সেই যে দিন মাত্রিনা তাহাকে পরিবেষণ করিতেছিল, আর সেই দিন যখন ভদ্রলোকটি বুটজুতার ফর্‌মাস দিতে আসিয়াছিলেন।

ক্রমশ মিচেলের উপর সাইমনের স্নেহ ও শ্রদ্ধা বাড়িতেছিল। আজ আর সাইমন্ এ অপরিচিতের পরিচয়ের জন্য ব্যাকুল নয়। এখন তাহার সদাই আশঙ্কা, কবে এ ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

সকলে মিলিয়া একদিন সেই কুটীরে বসিয়া নিজের নিজের কায করিতেছে। ছেলেগুলি জানালার উপর চড়িয়া নামিয়া লাফালাফি করিয়া খেলা করিতেছে। মাত্রিনা ছেলেদের ময়লা কাপড়গুলি কাচিতেছে, সাইমন্ একটা জুতায় সোল ঠুকিতেছে, আর মিচেল জানালার সম্মুখে বসিয়া প্রস্তুত প্রায় একজোড়া জুতার গোঁড়ালিতে মোম ঘষিতেছে। সাইমনের এক পুত্র মিচেলের কাঁধে হেলিয়া পড়িয়া কহিল—"দেখ দেখ মিচেল কাকা, কেমন ছোট দু'টি মেয়ে আস্‌ছে। আহা, একটী বুঝি খোঁড়া, নয়

মিচেল কাকা ? এইদিকেই তো আস্‌চে ? এখানেই আস্‌বে বুঝি ?”

মিচেল হাতের কায নামাইয়া রাখিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল। সাইমন্ মিচেলের এই ভাবান্তরে আজ একবারে হতভম্ব হইয়া গেল। এতদিন যে মিচেল এখানে আছে, কথনও সে একবার ভুলিয়াও কখন পথের পানে চায় নাই—আজ তাহার একি ? সে যে একদৃষ্টে তাকাইয়াই রহিয়াছে ! সাইমনও ব্যাপার কি জানিবার নিমিত্ত পথের দিকে চাহিল। দেখিল একজন সুবেশা মহিলা ছোট ছোট দুইটি মেয়ের হাত ধরিয়া তাহার বাড়ীর পানে আসিতেছেন। মেয়ে দু'টির প্রত্যেকেরই গায়ে একটি করিয়া গরম জ্যাকেট ও তাহার উপর একটি শালের ওড়্‌না। মেয়ে দুটি খুবই ছোট ; কিন্তু দুটির চেহারায় এত মিল, যে একটি যদি খোঁড়া না হইত, তবে কোন্‌টি কে চিনিতে মহা মুস্কিল বাধিত।

মহিলাটি মেয়ে দুটিকে আগে করিয়া আস্তে আস্তে দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন।

“কৈ গো মিস্ত্রী কোথায়—”

“আসুন্, আসুন্, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। বসুন্, বসুন্। হুকুম ?”

মহিলাটি বেঞ্চের উপর বসিলেন। মেয়ে দুটি ভয়ে

ভয়ে তাঁহার হাঁটু দুটিতে ঠেস্ দিয়া কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"আমি এই মেয়ে দুটির জন্যে দু'জোড়া জুতো চাই।"

"তা বেশ। তবে এত-ছোট জুতো আমরা এর আগে কখনো করিনি। সেই জন্যে···মোটের উপর চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।···হাঁ, এর ভিতরটায় কি শুধু চাম্‌ড়াই থাক্‌বে, না একটা কাপড় বসিয়ে দেব? আপনার যা পছন্দ বলুন। এই যে মিচেল্, আমার কর্ম্মচারী—এ খুব ভাল কারিগর।"

সাইমন্ পিছন ফিরিয়া দেখিল যে মিচেল সেই মেয়ে দু'টির পানে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে। ইহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মেয়ে দু'টি বাস্তবিক বেশ সুন্দরী। বয়স প্রায় ছয় সাত বৎসর।—কেমন টল্‌টলে গোলাপফুলের মত গাল দুটি—কেমন কালো চোখ দুটি,—কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা—যেন দুখানি ছবি! কিন্তু মিচেল এদের পানে এমন করিয়া চাহিয়া কেন?—ওর মৎবলটা কি?—মিচেলের চাহনি ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া সাইমন্ ভাবিল, বুঝি এরা এর পরিচিত!

রমণী সেই খোঁড়া মেয়েটিকে হাঁটুর উপর তুলিলেন। মিচেল তাহাদের মাপ লইল। রমণী বলিলেন—"মাপ দুটো নিলেই হবে। তিনপাটি জুতো তো একই মাপের,

আর একপাটি কেবল এর খোঁড়া পায়ের।—এরা দু'টি যমজ কিনা, পা দু'টির মাপও তাই একই।"

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল,—"এ মেয়েটি খোঁড়া কি করে হল মা ঠাকরুণ? জন্ম থেকেই কি এম্‌নি?"

"না, ওটা ওর মার দোষে হয়েচে।"

মাত্রিনার কৌতূহল আর বাধা মানিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে এ দুটি কি আপনার মেয়ে নয়? আমি ভেবেছিলাম আপনিই এঁদের মা।"

"না মুচিবৌ, আমি এদের মা তো নই-ই, কোনও সম্বন্ধ পর্য্যন্ত এদের সঙ্গে আমার নেই। এরা আমার পুষ্যি মেয়ে।"

"সে কি? আপনি এদের কেউ নন্ অথচ মানুষ কর্‌চেন?"

"না করে কি করি, মা? আমি এ-দিকে মানুষ কর্‌বারই ভার নিয়েচি যে! আমারও একটি ছেলে ছিল; ভগবান্ তাকে কেড়ে নিলেন। কিন্তু তাকেও কখনও আমি এদের চেয়ে ভালবাসিনি।"

"এরা তবে কার সন্তান?"—বলিয়া মাত্রিনা সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মহিলা যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপত এই :—

"আজ ছ' বছর হলো এরা বাপ মা হারিয়েচে। এক মঙ্গলবারে এদের বাপ মারা গেল, ফিরে শুক্রবারে

মায়েরও পরমায়ু শেষ হ'ল। এরা ভূমিষ্ঠ হবার পর এদের মা কয়েক ঘণ্টা মাত্র বেঁচে ছিল। আমি আর আমার স্বামী ছিলাম এদের খুব নিকট প্রতিবেশী। এদের বাপ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে মাথায় গাছ পড়ে মরে যায়—এত সাংঘাতিক রকমে আঘাত লেগেছিল যে বাড়ী নিয়ে আসার পর খুব অল্পক্ষণই বেঁচে ছিল। এই দুর্ঘটনার দু'দিন পরেই এদের জন্ম হয়। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় প্রাণী কেউ ছিল না, কেই বা দেখে, কেই বা শোনে, কেই বা প্রসূতির সেবা শুশ্রূষা করে! তাতে আবার প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রসূতিও মারা পড়ল। আমি খোঁজ নিতে গেলাম। গিয়ে দেখি যে এই মেয়েটিও মরার মত হয়ে পড়ে আছে। বৌটি এর একটা পা চেপে, মরে পড়ে আছে। কাযেই তখন একটা মহা সমস্যা উঠ্‌লো, কি করে এই নিরাশ্রয় শিশু দু'টিকে বাঁচান যায়? কে এদের ভার নেয়? গাঁয়ে সে সময় একমাত্র ছেলে-কোলে আমিই ছিলাম। আট মাস আগে আমার খোকা হয়েছিল। ঠিক হলো যে আমাকেই এ দুটির ভার নিতে হবে।

"বাড়ী নিয়ে এলাম; এ খোঁড়া মেয়েটি যে বাঁচিবে এ ভরসা আমার ছিল না বলে আমি এর দিকে বড় একটা চাইতাম না। এক পাশে ফেলে রেখে দিতাম। কিন্তু শেষে ওর মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যেতে

লাগল! আমি তিনটি শিশুরই মা হলাম—আমার খোকাও বেঁচে ছিল কি না। আর সে সময় আমার বয়সও কম ছিল, শরীরে সামর্থও ছিল, আর ভগবান মুখ তুলে চাইলেন—তিনটি শিশুকেই আমি মানুষ করে তুল্‌তে লাগ্‌লাম। কিন্তু দু'বছর বয়সে ভগবান আমার খোকাকে কেড়ে নিলেন—আর আমার ছেলেপিলেও হল না। কাযেই এ-দিকে আমি পেটে না ধরলেও—তেম্‌নিই ভালবাসি। এরাই এখন আমার চোখের আলো, বুক্ জুড়োনো মাণিক!"

রমণী উঠিলেন। সাইমন্ ও মাত্রিনা উভয়েই তাঁহাকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়া মিচেলের কাছে গিয়া বসিল। মিচেল তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হাত দুটী যোড় করিয়া হাঁটুর উপরে রাখিয়া, ঊর্দ্ধ মুখে ঢুলু ঢুলু নয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল! তাহার অধর প্রান্তে খানিকটা স্নিগ্ধ হাসি জমাট হইয়া লাগিয়াছিল।

সাইমন্ জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাই মিচেল, তুমি অমন করে বসে' আছ যে?"

মিচেল হাতের যন্ত্রপাতি নামাইয়া গায়ের জামা কাপড় খুলিয়া, আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাইমন ও মাত্রিনাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিল—

"ভগবান্ আমায় ক্ষমা করেছেন; তুমিও আমায় ক্ষমা কর বন্ধু।"

মিচেলের দেহ হইতে যেন একটা জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

সাইমন তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া সসম্ভ্রমে মাথা নত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল—"মিচেল, তুমি তো ভাই আমাদের মত মানুষ নও দেখ্‌চি।—তোমার পানে আর চাইতে পার্‌চিনে কোন কথা জিজ্ঞসা কর্‌তে সাহস হচ্ছে না যে দিন আমি তোমায় প্রথম দেখি আর বাড়ী নিয়ে আসি, সে দিন তোমায় অমন বিমনা ও বিমর্ষ কেন দেখেছিলাম; ভাই? তারপর, যখন আমার স্ত্রী তোমায় খেতে দিলেন, তখন তোমায় যেন অনেকটা প্রসন্ন বলে বোধ হয়েছিল। তুমি সেদিন একটু হেসেও-ছিল। তার পর কতদিন পরে, যখন সেই ভদ্রলোকটি জুতোর ফর্‌মাস্‌ দিতে এসেছিলেন—সে দিনও তোমায় বেশ একটু খুসী খুসী দেখেছিলাম। আর আজ এই স্ত্রীলোকটি যখন মেয়ে দুটিকে নিয়ে এল—তখন আনন্দে তোমার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছিল।—একি! তোমার গা হতে এ সমস্ত আলো বেরুচ্চে কেন ভাই?—আর এই এত দিনের মধ্যে তোমার মুখে কেবল তিন দিনই কেন বা হাসি দেখলাম?"

সে উত্তর করিল—"আমার আনন্দ আর আজ ধর্‌ছে না গো—আমার সুখের আর সীমা নেই! ভগবান্‌

আমায় ক্ষমা করেছেন্। তিনটি জিনিষ শিক্ষা কর্‌বার জন্যে ভগবান্ আমায় আদেশ করেন! আজ সে আজ্ঞা-পালন শেষ হ'ল,—সে তিনটি বিষয়ে শিক্ষা আজ আমার সমাপ্ত হ'ল। সে জন্যে আমি কেবল তিনটিবার মাত্র হেসেছি। আজ আমার শিক্ষার শেষ।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া সাইমন বলিল—"মিচেল্, তুমি কি বলচ'? ভগবান্ তোমায় ক্ষমা করেচেন! তবে কি তিনি তোমায় সাজা দিয়েছিলেন? কেন সাজা দিয়েছিলেন ভাই? আর, সে আদেশ তিনটিই বা কি? দয়া করে' আমাদিগকে বল'—আমরাও তা' শিখি!"

সে বলিল—"হাঁ, ভগবান্ আমায় শাস্তি দিয়েছিলেন; কারণ আমি তাঁর কথার অবাধ্য হয়ে, তাঁর আদেশ অমান্য করেছিলাম।—আমি একজন স্বর্গদূত ছিলাম। ভগবান্ একদিন একটি স্ত্রীলোকের আত্মা নিয়ে যেতে আমায় বলেন। পৃথিবীতে নেমে এলাম। এসে দেখি রমণীটি খুবই পীড়িত। তার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই, সে আবার দুটি যমজ কন্যা প্রসব করেছে। সদ্যঃপ্রসূত সেই শিশু দু'টি তার কোলের কাছে পড়ে' পড়ে' কাঁদচে, অথচ তার এমন শক্তি নেই যে বুকে তুলে নিয়ে স্তন দেয়। আমায় দেখেই সে স্ত্রীলোকটির আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে আমি কে, বা কেন এসেচি! আমায় করুণ স্বরে সকাতরে সে বল্লে—'দূত, ওগো ঈশ্বরের দূত,—

তিন দিন হল, গাছ চাপা পড়ে আমার স্বামী মারা গেছেন। আমার আর ভাই ভগ্নী, আত্মীয়, স্বজন—আপনার বল্‌তে একজনও পৃথিবীতে নাই।—পিতৃহীন এই দু'টি মেয়ের আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।—আমায় রক্ষা কর' এখন আমার আত্মা হরণ কোরো'না! আগে এ দুটি মানুষ হোক্—আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে শিখুক্—তারপর তুমি এসো, স্বর্গদূত!—না বাপ না মা, এই কচি ছেলে নইলে কি করে বাঁচবে?'

"রমণীর কথায় আমার বুক ফেটে গেল। ভগবানের আদেশও ভুলে গেলাম। রোরুদ্যমানা শিশু দুটির একটিকে তার বুকে, অপরটিকে তার বাহুর উপর তুলে দিয়ে, আমি শুধু হাতে স্বর্গে ফিরে গেলাম।—ভগবৎ চরণে নিবেদন কর্‌লাম—'প্রভু, সে স্ত্রীলোকটির আত্মা আন্‌তে আমি পার্‌লাম না। তিন দিন হল তার স্বামী মারা গেছে—আপাততঃ তার দুটি যমজ কন্যা হয়েছে—তার উপরে নিজেও সে খুব রুগ্ন। সে বড় বিব্রত। তাই সে এই শিশু দুটিকে মানুষ কর্‌বার জন্যে আমার কাছে তার জীবন ভিক্ষা করল।'

ঈশ্বর বজ্র গম্ভীর স্বরে আবার সেই আদেশ দিলেন—'ফিরে যাও, এক্ষুণি আবার ফিরে যাও—সেই স্ত্রীলোকটির আত্মা নিয়ে এসে অবিলম্বে হাজির কর। এখনও তুমি বুঝতে পারনি আমার আদেশ কি!—তুমি জাননা,

মানুষের মধ্যে কি আছে ; মানুষকে কি দেওয়া হয় নি ; এবং মানুষ কি করে বাঁচে!—এই তিনটি বাক্যের অর্থ তোমার শেখা প্রয়োজন। যতদিন না এ তিনটি বিষয় শিখ্‌চো, তত-দিন তোমার কাছে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়ে থাকবে। যাও, নিয়ে এসো! যতদিন না তোমার শিক্ষা শেষ হয় ততদিন স্বর্গ দ্বার তোমার কাছে রুদ্ধ। আজ হতে তুমি পতিত।"

আবার আমি পৃথিবীতে নেমে এলাম। এবার আর কোনও কথা শুন্‌লাম না—সে রমণীর আত্মা বহন করে নিয়ে গেলাম। তার বুক ও বাহু হতে সর্ সর্ করে শিশু দুটি মাটিতে পড়ে' গেল। যাবার সময় স্ত্রীলোকটি বাঁ' দিকে যেমন একটু ফিরলো, অম্‌নি একটি মেয়ের কি করে পা চাপা পড়ে' গিয়েছিল।—আমার বোঝা নিয়ে আমি আকাশ পথে উঠেচি, তখনও গাঁয়ের সীমা পার হইনি, হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় আমার পাখাদুটি খসে গেল, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। রমণীর আত্মা একাই স্বর্গপুরীতে চলে গেল। মাটিতে পড়ে আমি রাস্তার ধারে বসে রইলাম।"

সাইমন্ ও মাত্রিনা এতক্ষণ একাগ্র বিস্ময়ে চুপ করিয়া শুনিতেছিল। এতক্ষণে বুঝিতে পারিল যে এত দিন ইহারা কাহাকে খাওয়াইয়াছে পরাইয়াছে। পুলকে বিস্ময়ে এবং ভক্তিতে তাহাদের চক্ষু ভরিয়া আসিল।

স্বর্গদূত বলিতে লাগিলেন—"রাস্তার ধারে সেই আমি একা উলঙ্গাবস্থায় বসে রইলাম।—কি করি, নিরুপায়! মানুষের আচার ব্যবহারও তো কিছুই জানতাম না! ক্ষিদে ও শীতও আমার কাছে সেই প্রথম। কারণ আমি তখন মানুষ, পুরোপুরি মানুষ! কাযেই পেটের জ্বালায় ও শীতেই আমি সবচেয়ে বেশী কাতর হয়ে পড়্লান। কি করি, মহা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। নিকটে একটা গির্জ্জা ঘর দেখে মনে একটু ভরসা হল যে এ ঘরটি ঈশ্বরের নামে তো পবিত্র, এখানে গেলে একটু আশ্রয় পাবই;—ঠাণ্ডা হ'তে বাঁচ্ব। ও হরি, সে বাড়ীর দোরেও তালা বন্ধ! ঢুক্তে পেলাম না। কাযেই কোণ ঘেঁসে বসে কোনও রকমে শীত নিবারণ কর্তে লাগ্লাম। এমন সময় হঠাৎ মানুষের পদশব্দ পেলাম—দেখলাম একজন মানুষ একজোড়া বুট জুতো হাতে করে দোলাতে দোলাতে সেই দিকে আস্চে। আমি মানুষ হ'য়ে সেই প্রথম মানুষের মুখপানে চেয়ে দেখলাম। মনে আমার কেমন একটা ভয় হল! সে তুমি, সাইমন। তুমি বিড়্ বিড়্ করে' কি বক্ছিলে, সে ভাষা আমার বোধশক্তির সম্পূর্ণ অতীত না হলেও আমি শুন্তে পেলাম, তুমি বল্চ—'কি করে আমি আমার স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াই? এই দুরন্ত শীত থেকে পরিত্রাণ পাবার মত গরম কাপড় চোপড়ই বা কোথায় পাই?'

তুমি আমায় দেখ্‌তে পেলে। আমাকে দেখেই, কপাল কুঁচ্‌কে, মুখখানা বিষ করে, চলে গেলে। আমি হতাশ হ'য়ে পড়লাম। খানিক পরেই দেখি, তুমি আবার ফিরে এসেচ। আমি তোমার মুখপানে চাইলাম। দেখ্‌লাম যদিও মৃত্যুর ছাপ পরিস্ফুট, তবুও তাতে প্রাণের আলো কম নেই। আর সেই আলোতে ভগবানের মহিমা প্রতিবিম্বিত হয়ে তাকে আরো শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। তুমি আমার কাছে এলে, আমায় নিজের কাপড় খুলে দিয়ে আবৃত কর্‌লে, তারপর আমার হাতটি আস্তে আস্তে ধরে' তোমার নিজের বাড়ীতে এনে আশ্রয় দিলে। তোমার পত্নী দো'র খুলে দিতে এল! আমাদের সঙ্গে কথাও কইলে; তবু পুরুষ মানুষকে যখন প্রথম দেখে-ছিলাম, তখন তাকে এত ভয়ানক মনে হয় নি।

"ক্ষিদেয় হিমে এবং দুর্ব্বলতায় আমি দাঁড়াতে পর্য্যন্ত পার্‌ছিলাম না, তা দেখেও মাত্রিনা, তুমি আমায় গৃহে একটু স্থান দিতে অনিচ্ছুক হয়েছিলে।—সেই শীতের রাতে ক্ষুধিত ও হিমার্ত্ত অতিথিকে আবার নিরুদ্দিষ্ট পথে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে, মনে আছে? বুঝ্‌লাম, আমায় তাড়িয়ে নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে আন্‌চ। এমন সময়ে তোমার স্বামী যখন তোমাকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন তুমি ঠাণ্ডা হলে। অকস্মাৎ তোমার সব পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। তুমি আমায়

খেতে দিয়ে যখন অপেক্ষা কর্‌ছিলে, তখন তোমার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়। দেখ্‌লাম—তুমি আর সে-নারী নও! তোমার মুখে তখন ভগবানের মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট। অমনি আমার ভগবৎ-বাক্য মনে পড়্‌ল—'মানুষের মধ্যে কি আছে।' আমি আগে জান্‌তাম না, সে দিন জান্‌লাম—**মানুষের মধ্যে আছে প্রেম আর দয়া ও স্নেহ।**

"অধঃপাতের প্রথমদিনেই একটা সমস্যার ভঞ্জন হ্‌লো, একটা বিষয় শিখে ফেল্‌লাম—তাই মনের আনন্দে সেই দিন একটু হেসে ফেলেছিলাম।

"আমার সব শিক্ষা ত' একদিনে হবার নয়। তখনও দুটি কথা আমার শিখ্‌তে বাকী—মানুষকে কি দেওয়া হয়নি এবং মানুষ কি-করে' বাঁচে!

"তারপর একদিন দেখি যে এক ধনী, বিষয়-মদে মত্ত, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—একজোড়া জুতার ফরমাস্ দিতে এলেন। সে চায় তার বুট জোড়াটি এক বছরের মধ্যে যেন আর সারাতে না হয়—এম্‌নি মজবুত একজোড়া বুট! আমি তো তার খুব কাছেই ছিলাম—তবুও আমি তার মুখ দেখ্‌তে পেলাম না। দেখ্‌লাম তার মাথার উপরে আমার একজন স্বর্গসাথী মৃত্যুদূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ছাড়া তাকে আর কেউই দেখ্‌তে পায়নি, পাওয়া সম্ভবও নয়। তখনি বুঝ্‌লাম যে আজকের সূর্য্যেরও যেটুকু পর-

মায়া, এ ব্যক্তির তাও নেই। ভেবে হাসি পেল যে, যার আর কয়েক ঘণ্টামাত্র জীবন, সে-ও এখনো এক বছরের জন্যে সব আয়োজন করচে! সে নিজেও জানে না যে এখনি তার সব ফুরিয়ে যাবে, সব ফেলে যেতে হবে।

"ভগবানের দ্বিতীয় আজ্ঞাও বুঝতে পারলাম—'মানুষকে কি, দেওয়া হয় নাই'। মানুষকে কেবল ভবিষ্যৎটা জানতে দেওয়া হয়নি। তাকে আশা ও মায়া দিয়ে ভুলিয়ে খুব খুসী করেই রাখা হয়েছে। কাযেই সেদিন সেই দ্বিতীয়বার একবার হেসে ফেলেছিলাম।

"তবুও আমার শিক্ষা শেষ হল না। তৃতীয় অনুজ্ঞা—'মানুষ কি করে' বাঁচে'—আমার তখনও শেখা হয়নি। দিনের পর দিন চ'লে যায়—আমি পরমপিতার শেষ আজ্ঞা পালনের প্রতীক্ষায় বসে রইলাম।

"ছয় বৎসর আমি স্বর্গভ্রষ্ট, আজ ঐ মহিলা, দুটি যমজ মেয়ে নিয়ে এলেন। আমি মেয়ে দুটিকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। পরে যখন শুনলাম যে আজও কি করে' তারা বেঁচে আছে—তখনি আমার শেষ শিক্ষাও সমাপ্ত হল!

"যখন সেই প্রসূতি এই দুটি নিরাশ্রয় মেয়ের মুখ চেয়ে, আমার কাছে তার প্রাণ-ভিক্ষা করেছিল, আমি আমার স্বর্গচ্যুতি নিশ্চয় জেনেও মুমূর্ষু মাতার সে অনুরোধ রক্ষা করতে সাহসী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যে, মা ছাড়া

সে দুটির বাঁচা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু কৈ তাতো হয়নি! এই নারী, এদের সম্পূর্ণ অপরিচিতা ও অনাত্মীয়া, আপনার বুকের রক্ত দিয়ে এদের বাঁচিয়ে তুলেচেন্। আপনার শরীর মাটি করে' এদের শরীর গড়িয়ে দিয়েছেন! এই মহিলাটির মুখে করুণাময় ভগবানের প্রতিচ্ছবি দেখে আমি আজ বুঝ্তে পার্লাম—'মানুষ কি করে বাঁচে!' মার্বার বা বাঁচাবার মালিক যে কে, তাও আমার এই সঙ্গে শেখা হয়ে গেল।

"কাযেই, আজ সম্পূর্ণ শিক্ষার অতুল আনন্দে আমি প্রাণ ভরে হেসেচি! আজ কি আমার কম সুখ, কম সৌভাগ্য? আজ ঈশ্বর আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেছেন, আজ আমার শিক্ষা সমাপ্ত।"

বলিতে বলিতে স্বর্গদূত নর-ধরণীর জীর্ণ বাস খুলিয়া ফেলিয়া, এক অসহ্য—তীব্র জ্যোতির্ম্ময় বসনে সজ্জিত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমশ ভাব-গদগদ ও শ্লথ হইয়া আসিতেছিল। বলিলেন—"বুঝেচি, **মানুষ বাঁচে প্রেমে**। বাঁচবার জন্যে চেষ্টা কর্লে বাঁচা যায় না!"—আওয়াজ ক্রমশ মধুরতর হইয়া আসিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন ঘরের ছাদ ফাটিয়া গেল। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত এক অপূর্ব্ব আলোকময় পথ নির্ম্মিত হইয়া গেল। স্বর্গদূত ভগবানের নাম গান করিতে করিতে সেই পথে যাত্রা করিলেন। সাইমন্ সপরিবারে মেঝের

মাটিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কক্ষ মধ্যে তখনও স্বর্গদূতের সেই অমৃতময় কণ্ঠরব প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

সাইমনের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে সে দেখিল যে, ছাদ যেমন তেমনিই অটুট আছে। সে তাহার ছেলে পিলে লইয়া আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। কেবল মিচেল নাই।*

---

* কাউণ্ট টলষ্টয়ের একটি গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

আমার জীবন

"আমার এ জীবনকাহিনী আমি লিখিতাম না" —আত্মজীবনচরিত-রচনাকারী অনেকেই এই বাক্যটির দ্বারাই গ্রন্থারম্ভ করেন। লিখিবার একটা না একটা অনিবার্য্য কারণও সঙ্গে সঙ্গে দর্শাইয়া থাকেন। আমি সুতরাং ও পথ পরিত্যাগ করিলাম। পাঠকগণ জানিয়া রাখুন, আমি—খোস-মেজাজে বলিতে পারি না—কিন্তু সুস্থদেহে বহাল-তবিয়তে এবং বিনা কাহারও অবৈধ উত্তেজনায় (undue influence) আমার এই জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আর একটা কথা। অনেকেরই আত্মচরিত হইতে বিনয়ের সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া এই উপদেশবাণী ফুটিয়া উঠে—"আমার মত কে আছে? তোমরা সকলে আমার মত হইতে চেষ্টা করিবে।" কিন্তু আমার এই কাহিনীর উপদেশ—"সাধু সাবধান—আমার মত কেহ হইতে চেষ্টা করিও না।"—যদি একজন মনুষ্যও ইহা পাঠে সাবধান হয় তবে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি ভূমিকা অথ মুখবন্ধ এইবার আরম্ভ করি।

এখন আমার মাসিক পত্র উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ হয়ত আমায় চিনিতেই পারিবেন না, তাঁহাদিগের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি আমি ভুতপূর্ব্ব "অঞ্জলি"

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ঠিক কত বয়সে এই বঙ্গসাহিত্য-সেবারূপ দুরারোগ্য ব্যাধি যে আমায় আক্রমণ করিয়াছিল তাহা সঠিক বলিতে পারি না। বয়স কমাইয়া, অতি শৈশবাবস্থায় আমার হৃদয়ে কবিত্বের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল বলিয়া নিরীহ পাঠককে প্রতারণা করিব না। তবে এটা বেশ মনে আছে, স্কুলে খুব নীচে ক্লাসে যখন পড়িতাম, তখন রামায়ণ, মহাভারত ও অন্নদা-মঙ্গল পড়িয়া পড়িয়া "পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে" পদ্য লিখিতাম বটে। তখন 'কবিতা' নামই চলিত হয় নাই—সমিল পদকে লোকে পদ্যই বলিত। কি যে লিখিতাম তাহা আজ একে-বারেই মনে করিতে পারি না, কিন্তু লিখিতাম খুবই।

একখানি শ্রীরামপুরে কাগজের খাতা ছিল—তাহাতে সেগুলি বেশ ভাল করিয়া নকল করিয়া রাখিতাম। এ সময়টা ছিল ভালই। কোন জ্বালা যন্ত্রণা আশা দুরাকাঙ্ক্ষা কিছুই ছিল না। লিখিতাম মাত্র। তাহাও বিশেষ সতর্কতার সহিত—পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে। পড়ার ডেস্কের ভিতর অনেক পুরাতন খাতার মধ্যে আমার সেই পদ্যের খাতাখানা লুকান থাকিত।

বাবা দর্ম্মাহাটায় লোহার আড়ত করিয়া বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। কলিকাতায় একখানি বাড়ীও করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি ধনীর সন্তানই ছিলাম বলিতে হইবে।

আমার নিজের আর ভাই বা ভগিনী কেহই ছিল না। পিতা মাতার অধিক বয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া আমার আদর যত্ন একটু বেশী পরিমাণই ছিল। না হইবে কেন? প্রৌঢ় পিতামাতার—কত ভাগ্যের আমিই একমাত্র বংশধর! আমার বাঁচাই তাঁদের যে অনন্য কামনা!

পিতামাতা মনে না কষ্ট পান, সেই জন্য আমারও প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল, কি করিলে আমি বাঁচিয়া থাকি। সুতরাং বুড়া বাপ মায়ের মুখ চাহিয়া এই দিকেই আমায় অধিক মনোনিবেশ করিতে হইল। কাযেই লেখাপড়ার তত সুবিধা হইল না।

বাবা আমায় প্রথমে ত স্কুলেই যাইতে দিতেন না, পাছে একাকী কোনও বিপদ বাধাইয়া বসি। পরে, ঘরের গাড়ীতে চড়িয়া চাকরের কোলে বসিয়া স্কুল যাইতে লাগিলাম। তখন আমি বেশ বড় হইয়াছি মনে আছে, কিন্তু কতবড় তাহা বলিতে পারি না। কারণ, মনে আছে, এই স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা আমাকে "খোকাবাবু এসেছে রে খোকাবাবু এসেছে" বলিয়া নানারূপ পরিহাস করিত। কেহ কেহ "নির্ভীক সমালোচকের" মত রূঢ় ভাষায় বলিত "ধেড়ে ছেলে, আবার কোলে চড়ে আসা হয়েছে।" এই প্রথম ধাক্কা খাইয়া, কোলে বসিয়া আর স্কুলে যাইতাম না।

বাপ মায়ের জীবনানন্দ হইয়া দিন দিন বেশ বাড়িয়া চলিলাম। কোনও ভাবনা নাই। পৃথিবীর সমস্ত ছাত্র

অপেক্ষা আমার ছাত্রজীবন অনেক বেশী সুখের ছিল। কারণ, স্কুলে বা বাড়ীতে কথনও কেহই আমায় একদিনের জন্যও পড়িতে তাগাদা করেন নাই। এজন্য এখানে আমি আমার শিক্ষকদের নিকটও অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বড় লোকের ছেলের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মত, লেখা-পড়াও ধীরে ধীরে নীরবে চলিতে লাগিল। ফলে, এক এক ক্লাসে দুই বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত চলাফেরা করিয়া অবশেষে আমি প্রবেশিকার তোরণদ্বারে পৌছিলাম। সে দ্বার পার হওয়া কিন্তু আমার সাধ্যাতীত হইল। সুতরাং স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইহার আরও এক কারণ ঘটিল, এই সময়ে পিতার মৃত্যু হয়। তখন আমার বয়স বিশ বৎসর।

আমার দূর সম্পর্কীয় অমূল্যদাদা বহুদিন পরে বাঁকীপুর হইতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম তিনি একজন কবি। কয়েকখানি মাসিকপত্র খুলিয়া নিজ রচনাও আমায় দেখাইলেন। আমি সেগুলিকে "পদ্য" বলিলে তিনি আমায় বুঝাইয়া দিলেন যে ও শব্দটা নিতান্ত গ্রাম্য—এখনকার লোকে বলে "কবিতা।" মাসিক পত্রও এই প্রথম দেখিলাম। আমার পিতার আড়তে কথনও উক্ত পদার্থের নামও শুনি নাই।

অমূল্যদাদাই হইলেন সাহিত্যে আমার দীক্ষাগুরু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিত্বরূপ এক দুরারোগ্য ব্যাধি বাল্যকাল হইতেই আমার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল—এখন সে ব্যাধির প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

আমি যাবতীয় মাসিকপত্রের গ্রাহক হইলাম। উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর প্রায় সমস্ত মাসিকেই অমূল্যদাদা রচনা পাঠাইতেন।

যে সকল বড়লোকের নাম শুনিতাম, তাঁহাদের লেখা-গুলি অতি মনোযোগ সহকারে পড়িতাম; আর খুঁজিতাম বড়-লেখার সেই লুকানো কলকাঠিটি কোথায়। সেটার যদি একবার কোনও প্রকারে সন্ধানই পাই, তো আমায় আর পায় কে? কিন্তু সে মায়ামৃগের কোনও সন্ধান পাইলাম না। কাযেই, মাসিকপত্রে প্রকাশিত কবিতাগুলি আগে পড়িয়া, তাহাদের ভাব, কতককতক ভাষা, ভাল মনোমত শব্দ চুরি করিয়া, আমি নূতন করিয়া আবার কবিতা লিখিতে সুরু করিলাম।

পিতৃবিয়োগের পর একবৎসর গত হইলে আমার বিবাহ হইল। সুন্দরী দেখিয়াই বিবাহ যে করিয়াছিলাম ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য।

বিবাহের পূর্ব্বে সব কবিতাই মানসী-প্রিয়ার উদ্দেশে রচিত হইত কিন্তু ইদানীং হাতের গোড়ায় পাইয়া বধূর স্কন্ধেই আমার কবিতা চড়িয়া বসিল। সে বালিকা। তখন তাহার বয়স মাত্র একাদশ। সে বেচারী অস্থির

হইয়া উঠিল। একা আমার কাছে আসিতে সে আতঙ্কিত হইত—পাছে কবিতা শুনিতে হয়। কলিকাতার বাসায় বসিয়া সে "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে বিদুষী ঠাওরাইয়া মনে মনে অপূর্ব্ব পুলক ও প্রসাদ অনুভব করিয়াছিলাম। সুতরাং কবিতায় ভাবা, কবিতায় স্বপ্ন দেখা—পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্যই আমি কবিতায় সম্পন্ন করিতে চেষ্টিত হইলাম।

(২)

চারিবৎসরে দুইটি কন্যাসন্তান জন্মিল। চটিয়া স্ত্রীকে কবিতা শোনান বন্ধ করিয়া দিলাম।

ভাল প্রাণের বন্ধু আমার কেহ ছিল না যে প্রাণ খুলিয়া দুটা কথা কই। মাসিকপত্রে আমার লেখা নাই বা প্রকাশ হইল—আমি কবি ত বটে! আমি যে কবি, তখন এ বিশ্বাসটুকু আমার দৃঢ় হইয়াছিল। সুতরাং কবিতা শোনাইবার লোক খুঁজিতে লাগিলাম। আর শুধু তো শোনাইলে চলে না—"কেমন লাগ্‌লো"—এই প্রশ্নের যাহা ভদ্রতাসঙ্গত একমাত্র উত্তর, তাহার মধ্যে যে কি-সুধা সঞ্চিত আছে, তাহা আর লেখকশ্রেণীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। নিজের লেখা যত বেশী লোককে নিজে পড়িয়া শোনান যায়, লেখকের তত বেশী চরিতার্থতা। কিন্তু আমার অদৃষ্টে এ তৃপ্তিসুখ তখনও

পর্য্যন্ত ভালমত ঘটে নাই। এজন্য প্রাণে সর্ব্বদাই একটা নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতাম। দুটি একটি কবিতা রোজই লিখিতাম ; কিন্তু লিখিয়া, উক্তরূপে শোনাইবার লোকাভাবে—অমন সুন্দর সুন্দর কবিতা যেন প্রাণহীন বিস্বাদ বলিয়া বোধ হইত।

আবার, শুধু লিখিয়া ফল কি? অমূল্যদাদার মত, ছাপাইবার ব্যবস্থা কেমন করিয়া হয়? ভাল ভাল চিঠির কাগজে, খুব ধরিয়া ধরিয়া, সাধ্যমত স্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে কবিতাগুলি নকল করিয়া, ২।১টি করিয়া সমস্ত মাসিকপত্রে পাঠাইতে লাগিলাম। ফেরৎ-প্রাপ্তির জন্য অর্দ্ধ-আনার ডাকটিকিটও সঙ্গে পাঠাই।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এমন, যে অধিকাংশ কবিতাই বামদিকের কোণে "অমনোনীত" লিখিত হইয়া ফেরৎ আসে। কোন কোনও কাগজওয়ালা ছাপেনও না, ফেরতও দেন না, টিকিটখানি আত্মসাৎ করেন। তাঁহাদিগকে চিঠির পর চিঠি দিই, উত্তর নাই।

অবশেষে গ্রাহক নম্বর দিয়া কবিতা পাঠাইতে সুরু করিলাম। কাগজ ছাড়িয়া দিবার যখন ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলাম—তখন কেহ কেহ দশটির মধ্যে বাছিয়া একটি ছাপিতে লাগিলেন। প্রাণ বাঁচিল—হাতে স্বর্গ পাইলাম।

বছর চারেক এইরূপ উমেদারী করিয়াই আমি

'লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি' হইয়া উঠিলাম—অর্থাৎ বহি ছাপাইলাম। সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল।

সাহিত্যিক সভায় যাই, সাহিত্যিকদিগকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করি, "বেঙ্গলী"তে সেই সব সংবাদ বাহির হয়, আর বুকখানা দশ হাত হইয়া উঠে। এইরূপে আরও তিন বৎসর কাটিল।

প্রায় সমস্ত সম্পাদকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হইয়াছে। কেহ কেহ আমার নানাবিধ সদ্‌গুণ এবং বিপুল প্রতিভা দেখিয়া, ছোট গল্প লিখিতে উপদেশ দিলেন। অনেক সম্পাদকই বলিলেন—"কবিতা, মশায়, আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি পাই—কিন্তু ছোট গল্পের বড় অভাব। অথচ ঐটেই সবাই পড়ে। আর গল্প নৈলে মাসিকও চলে না। কবির চেয়ে গল্প-লেখকেরই আদর বেশী।"

বুঝিলাম, কবিতা যতই ভাল হউক না কেন, উদীয়মান কবি ছাড়া সে মধুর অন্য ভ্রমর নাই; কিন্তু গল্প যেমনই হউক, সেটি পড়িবেনা মাসিকপত্রের এমন পাঠক অতি বিরল।

গল্পলেখকদের অধিক আদর? তথাস্তু। কবিতা লেখা ছাড়িলাম। গল্প ধরিলাম।

কবিতা ছাড়িবার আরও কারণ ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যেই আমার চারিখানি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিতরে যাহাই থাকুক্ না কেন, ছাপা বাঁধাই কাগজ

ও আপন আলোকচিত্রে বই কয়খানিকে যতটুকু সম্ভব শোভন করিয়াছিলাম। সুন্দর মরক্কো চাম্‌ড়ার বাঁধাই—যার মলাটের দামই অন্ততঃ দুই টাকা—আর্ট কাগজে ছাপা, এক পৃষ্ঠার পদার্থকে চারিপৃষ্ঠায় বাঁটিয়া আয়তন বাড়াইয়াও দাম নাম মাত্র একটাকা ধার্য্য করিয়াছিলাম—কিন্তু তথাপি চারিখানি পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থে একখানি পুস্তকের এক-চতুর্থাংশ খরচ পর্য্যন্তও উঠিল না।

বিজ্ঞাপনের কসুর করি নাই। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক—সমস্ত কাগজে কবির ফটো ও বইয়ের ব্লকসহ মাসে মাসে পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছিলাম। সমালোচনাও ভাল রকম হইয়াছিল, কিন্তু হায়রে বাঙ্গালা দেশের "ভবী"গণ! কিছুতেই তাহারা ভুলিল না। আমার বই বিক্রয় হইয়া টাকা উঠিল না বলিয়া যে দুঃখ, তাহা নয়। আমার ইচ্ছা পুস্তক প্রচার—নাম প্রচার! এ দু'য়ের একটিও হইল না এই দুঃখ! এ কি কম দুঃখ? কবি ছাড়া কবির এ ব্যথা জগতে আব কেহই বুঝিবে না।

কবিতা দ্বারা যখন উক্ত কার্য্য 'সিদ্ধ' না হইয়া 'দগ্ধ'ই হইল, তখন কবিতা ছাড়িব না কেন?

আর একটা কথা। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা—বিজ্ঞাপন অনুসারে নহে—সত্য সত্যই—শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক, তাঁহারাও জীবনের আদিম বর্ব্বরাবস্থায় কবিই ছিলেন। কবিতাতেই তাঁহাদের

হাতে খড়ি। আমার সঙ্গে মিলিয়া গেল। আর কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক—আমার কপালে গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকের অমর-যশ অলক্ষ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে—আমি দিবালোকের মত পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। আমি অবধারিত বিখ্যাত ঔপন্যাসিক।

পাঁচবৎসর ক্রমান্বয়ে গল্প লিখিলাম। তাহার অনেকগুলি মাসিক পত্রে বাহিরও হইল।

কবিতার পিণ্ড ছাড়িয়া, গল্পের ষোড়শ করিয়া পাঁচ বৎসব বঙ্গভারতীব মাসিক ক্রিয়া করিলাম। পাঁচখানি গল্পপুস্তকও ছাপিলাম। তবু দেখি, গল্পলেখক বলিয়া আমায় কেহ গ্রাহ্যই করে না। কোনও প্রসঙ্গে গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকের নাম করিতে হইলে, বহুকাল-শ্রুত পর-যশাপহারী সেই কয়জনেব নামই করে, আমার নাম কেহ ভুলিয়াও করে না। রাগে অভিমানে আমাব হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

(৩)

গত বৎসর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে—এবার পত্নীও স্বর্গারোহণ করিলেন।

চারিটি শিশু কন্যা রাখিয়া পত্নী যখন এমন অকালে চলিয়া গেলেন—তখন দুঃখিত অপেক্ষা বিপন্নই বেশী হইয়াছিলাম। ঘরে আমার বৃদ্ধা বিধবা পিতৃস্বসা ও তাঁহার একটি বিধবা কন্যা ছিলেন, সেই অনেকটা সুবিধা হইল।

আমার দিদি শিশুগুলিকে পালনের ভার লইলেন। আমি অকূলে কূল পাইলাম।

একমাস যাইতে না যাইতেই, তাঁহারা আবার আমায় সংসারী হইয়া পুত্রমুখ দর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি সে কথায় একবারেই কর্ণপাত করিলাম না।

পত্নীবিয়োগে আমি যে দুঃখিত হই নাই তাহা নহে, —তবে সত্য কথা বলিতে গেলে সে দুঃখটা কাল্পনিকই বেশীমাত্রায় এবং সে শোকপ্রকাশের ভাণও হইল অতিরিক্ত। যদিও সন্ন্যাসী হইয়া লোটা কম্বল লইয়া সংসার ত্যাগ করিবার মৎলব করি নাই, কারণ তাহাতে অনেক বিঘ্ন, তবে পত্নীর শোকে এই সুযোগে আর একখানি "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" লিখিব, এ প্রতিজ্ঞা শ্মশান হইতে ফিরিবার পথেই করিয়াছিলাম। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই একখানি বহির মত কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। কতক মাসিকেও ছাপা হইল, বাকী মাসিকের জন্য অপেক্ষা না করিয়া একবারে কাব্যাকারে প্রকাশ করিলাম। পত্নীর নাম ছিল মায়া, কাযেই কাব্যের নাম রাখিলাম "মায়ার ডোর"।

বিপত্নীক হইয়া অন্ততঃ একটি বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলাম। এতদিনে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, এইবার আমি বঙ্গ-সাহিত্যে সত্য সত্যই বিখ্যাত এবং অমর হইব। কারণ,

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া জলধর সেন প্রভাত মুখুয্যে অবধি কত কত বঙ্গ-ভারতীর বরপুত্র বিপত্নীক—অন্ততঃ প্রথম পক্ষের স্ত্রী কাহারও জীবিত নাই।

আরও ভাবিলাম, এইবার সাহিত্যচর্চ্চায় যোল আনা মনঃসংযোগ করিবার সুবিধা হইল। সাহিত্যসেবাও একপ্রকার সন্ন্যাস—সুতরাং বিবাহ আর কোনমতেই করা হইতে পারে না।

বয়স আমার তখন ৩০।৩২—পূর্ণ যৌবন, অন্নচিন্তা ছিল না, রক্ত গরম, সবই সাজিত।

যাহা হউক, এই সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমি একরকম অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াই কাগজে কাগজে "মায়ার ডোর" সমালোচনা করিতে পাঠাইলাম।

ভাবিয়াছিলাম, সকল কাগজেই বহিখানির অজস্র প্রশংসা হইবে। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। অধিকাংশ কাগজেই বহিখানির নিন্দা বাহির হইল।

বুঝিলাম—সাহিত্যের বাজারে আমার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ভিতর হইতে হৃদয়দেবতা ঢক্কা-নিনাদে কেবল আদেশ করিতে লাগিলেন—"বৎস নিরীহ নির্দ্দোষী নবীন, যদি বঙ্গসাহিত্যে যশে অমর হইতে চাও, তবে এ অন্যায়ের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ কর, কর, কর।"

সমস্ত সম্পাদকের প্রতি আক্রোশ আমার বাড়িয়া

উঠিল। শান্ত ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে মূলতঃ ইহারাই অধিকতর দোষী।

আমার বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ অক্লান্তভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছি। ইহা সত্ত্বেও যখন কতকগুলি অর্ব্বাচীন যুবক-সমালোচক আমার লেখাকে যাচ্ছেতাই বলিতেছে, প্রবীণ লেখক সম্মান না করিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে তখন তাহা যে রাস্কেল-প্রকৃতি সম্পাদকগণের ইঙ্গিতেই হইতেছে সে বিষয়ে আমাব সন্দেহ আর রহিল না।

বুক বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও কাহাকেও লেখা দিবনা—দুয়ারে মাথা কুটিয়া মরিয়া গেলেও, না। দেখি কেমন মাসের ঠিক পয়লা তারিখে কাহার কাগজ বাহির হয়! আমার গল্প এবং কবিতার জন্য নিশ্চয়ই আট্‌কাইয়া যাইবে—তখন এই অশরণের শরণ লইতেই হইবে।

এই ভরসায় সম্পাদকদিগকে খুব কড়া করিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। যে যে কাগজে আমার নিন্দা বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকে তাদৃশ রচনা প্রকাশ করার জন্য বিস্তর ভৎ‍র্সনা করিয়া পত্র লিখিলাম। তাহারা জবাব দিল—"মশায়, অমুককে জানেন না? তাঁর লেখা ফেরৎ দিই কি করিয়া? তা ছাড়া, আমরা কোনও লেখকের স্বাধীন মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করি না।"

দুইদিন—দশদিন—বিশদিন—একমাস—দুইমাস—অপেক্ষা করিলাম—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত আসিল না। বোধ হয় সবাই চটিয়া গিয়াছে। রাস্তায় কোন সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি কতপ্রকার আলাপ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা করেন, কিন্তু লেখা চাহেন না। আমার গা জ্বলিয়া যায়। কাযে অকাযে সকালে বিকালে মাসিকপত্র কার্য্যালয়ের সম্মুখ দিয়া অকারণ ব্যস্তভাবে চলিয়া যাই—যদি কেহ ডাকে! উঃ কি অহঙ্কার এই মাসিকপত্র সম্পাদকদের! কি অবিনয়! তবু যদি লেখকদের নিকট লেখা ভিক্ষা না করিতে হইত!!

সম্পাদকগণের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া কিছুদিন আমার লেখা ছাপা হইল না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে আর দু'একটি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বয়স প্রায় চল্লিশ হইলে কি হয়, তখনও বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আমার যুবক-কবির মত অদম্য উৎসাহ, অধীর উচ্চাশা এবং অমিত অধ্যবসায়! তবু কিছুদিন চাপিয়া চুপিয়া কোনও রকমে দিন কাটাইলাম! পরে, দিন যাওয়া যখন দুর্ঘট হইয়া পড়িল—তখন ছোট কন্যা দুটির বিবাহের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলাম। প্রথম দুইটির বিবাহ পূর্ব্বেই দিয়াছিলাম।

ভগবান যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন। ভাগ্যে সেই সময়ে এই কার্য্য করিয়াছিলাম—নহিলে আজ কন্যার বিবাহ আমার মহাদায় হইয়া উঠিত।

(৪)

চারিটী কন্যার বিবাহ ও বারখানি "বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ" প্রচার করিতে আমায় ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ত্রিশহাজার টাকা বাহির করিতে হইয়াছে। সুতরাং মাসিক সুদের হারও বিলক্ষণ কমিয়া গেল। গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া একদমে খরচ অনেকটা কমাইয়া ফেলিলাম। সুবুদ্ধিটা সময় থাকিতেই হইয়াছিল বলিতে হইবে—নচেৎ এই ত পরিণাম! সম্পত্তির মধ্যে তো ব্যাঙ্কের এই অবশিষ্ট বিশহাজার মাত্র টাকা! বড়লোক যে নয়, তার বড়লোক-প্রসিদ্ধি যে কি কষ্টকর, তাহা আমার মত যদি এ পৃথিবীতে আব কেউ থাকেন তো তিনিই বুঝিবেন। এটা না হয় আমি কোনও মতে চাপা দিতে পারি, কিন্তু প্রার্থীর দল তাহা বুঝে না। তাহারা পূর্ব্বপুরুষের মুক্তহস্তে দান সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে অসামান্য উদাহরণ দিয়া বিষম লজ্জায় ফেলে।

কি বিপদেই পড়িয়া গেলাম! না অর্থের দিক হইতে, না যশের দিক হইতে—কোনও দিকেই কিছু সুবিধা হইতে-ছিল না। একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল—আমার ভক্তবৃন্দ। তাহারা সন্ধ্যার পর আমার বৈঠকখানায় আসিয়া, আমার যে কোনও কবিতা বা যে কোনও গল্প পড়িয়াই, "অতি চমৎকার, অতি চমৎকার, বাঙ্গালা ভাষায় নূতন—একেবারে প্রথম শ্রেণীর" প্রভৃতি দেশী বিদেশী ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ

করিত এবং সুললিত অঙ্গভঙ্গি সহকারে সুর করিয়া সেই সকল লেখা পড়িয়া পরস্পরকে শুনাইত। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে আমার পদধূলি লইয়া ধন্য হইত। প্রথম প্রথম আমার কেমন বাধ-বাধ লজ্জা-লজ্জা ঠেকিত; পরে সেটা অভ্যস্ত হইয়া গেল। চা, চপ্, কাটলেটে প্রতি সন্ধ্যায় আমার দুই তিন টাকা ব্যয় হইয়া যাইত। কিন্তু প্রাণ ধরিয়া ও খরচটা আর কমাইতে পারিলাম না।

ছাপা হয় না, তবু লেখার বিরাম নাই। গল্পে ও কবিতায় খাতার পর খাতা বোঝাই হইয়া উঠিল। আমার এমন সুন্দর রচনাগুলি যখন ঘরে পচিতে লাগিল, তখন আমার প্রধান বন্ধু হিতৈষী ও ভক্ত সুকবি যদুনাথ সান্ন্যালের প্ররোচনায়, কাগজ বাহির করিতে সংকল্প করিলাম।

নিজেও বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলাম যে স্বয়ং সম্পাদক হইলে নিজের লেখা ত ইচ্ছামত ছাপা যাইবে—আর কিছু হউক বা না হউক! ভক্তগণ অভয় দিলেন যে তাঁহারা নিজেরা তো নিয়মিত লিখিবেনই, পরন্তু অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের নিকট হইতেও লেখা সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। গ্রাহক করিবার জন্য তাঁহারা দলে দলে দেশ বিদেশে বাহির হইবেন।

সম্পাদক হইয়া, কত লেখকের কত শত মিনতিপূর্ণ পত্র পাইব, কত লেখা, কত কবিতা, কত গল্প আমার

হস্তগত হইবে—আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সবই ছাপিতে পারি; না করিলে, কোনটাই না ছাপিয়া সবই ফেরৎ দিতে পারি, কিম্বা ছিঁড়িয়াও ফেলিতে পারি—সমস্তই আমার ইচ্ছাধীন। নিন্দুকগণের কোনও লেখা আসিলে তৎক্ষণাৎ কটুমন্তব্যের সহিত ফেরৎ দিব। যাকে খুসী ছাপার অক্ষরে গালি দিব অথবা প্রশংসা করিব। শত শত লেখক আমার পরিচয় প্রার্থনায় আমার আফিসে আসিবে—একটু হাসিয়া কথা বলিলে তাহারা কৃতার্থ হইয়া গিয়া—তাহাই আরও পাঁচজনের নিকট গল্প করিবে! কত লোক কত লেখা ছাপিবার জন্য সুপারিস্ করিবে। পথে ঘাটে কত লোকে আমায় "অমুক কাগজের সম্পাদক" বলিয়া পার্শ্বস্থ বন্ধুকে চুপি চুপি দেখাইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার অলক্ষ্যে আমার মুখ পানে চাহিয়া থাকিবে। লোকে বলিবে কবি ও গল্পলেখক নবীনবাবু এখন অমুক কাগজের এডিটর।

সুতরাং কাগজ বাহির করাই স্থির হইল।

ছাপাইব কোথা? পরের প্রেসে? ছি! যদু বলিয়াছে, নিজে যদি একটা প্রেস কিনি তো সেই প্রেসে কাগজ ছাপা হয়, বাহিরের কায করিয়াও দুপয়সা রোজগার হয়। কারণ, ছাপাখানার আজকাল যত কদর, এত আর কোন পদার্থেরই নয়। ম্যানচেষ্টারের ধুতি অপেক্ষাও প্রেসের চলতি বেশী! যাঁহারা বাঙ্গালী-সাহেব, ধুতি পরিতে লজ্জিত

হন, তাঁহারাও কিন্তু বাংলা লিখিতে বাংলায় বই ছাপাইতে আজ কাল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

মাধব ভরসা দিয়াছে—কাযের যদি অভাব হয় তো পাঁচ বৎসর বিবাহের "প্রীতি-উপহার" ছাপিলেই প্রেসের খরচ উঠিয়া যাইবে। আমাদের সব বন্ধ থাকিতে পারে, বিবাহ ত বন্ধ থাকিবে না। আর প্রত্যেক বিবাহেই গড়ে পাঁচখানি করিয়া প্রীতি-উপহার!

সুতরাং প্রেস খরিদ স্থির হইয়া গেল। হিসাবপত্রও হইল। একটি প্রেস দশহাজার ও কাগজের এক বৎসরের খরচ পাঁচ হাজার—পনের হাজার টাকার প্রথমেই প্রয়োজন। অধীর উন্মাদনা ও উত্তেজনায় কিছুই ভাবিলাম না—ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলাম।

যদু, মাধব গোপাল, রামকালী, বিশ্বেশ্বর ইহারা স্বেচ্ছায় আমার সহকারিত্ব গ্রহণ করিল। যদু কাগজের ম্যানেজারী স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করিয়া আমায় যুগপৎ উৎসাহিত এবং কৃতজ্ঞ করিল।

খুব উৎসাহের সহিত গোড়া পত্তন হইল। যদুর বাড়ীর নিকটেই বাড়ী ভাড়া লইয়া প্রেস ও কার্য্যালয় বসাইলাম। আমার বসিবার ঘরে সম্পাদকীয় আফিস হইল। মাসিকের নামকরণ হইল "অঞ্জলি"।

সম্মুখে বৈশাখ মাসও পাওয়া গেল, সুতরাং "অঞ্জলি'র প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। মাসিক একশত পৃষ্ঠার উপর,

৩।৪ খানি পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্র এবং তদ্ভিন্ন প্রবন্ধ-কলেবরেও মাসে মাসে ২০।২২ খানি ছবি—বার্ষিক মূল্যের হিসাবে একরকম সস্তাই বলিতে হইবে।

"অঞ্জলি"র বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার পর হইতেই গল্প কবিতা প্রবন্ধ ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি মাসিকের রসদ আপনা আপনিই আসিয়া জুটিতে লাগিল। কিন্তু গ্রাহক হইবার পত্র কেহই বড় লেখে না। ভাবিলাম, এত সহজ ও সম্মানের পথ ছাড়িয়া আমি এতদিন কোন্ মায়ামৃগের সন্ধানে ফিরিতেছিলাম? এতদিন সম্পাদকগণের দ্বারে দ্বারে নির্ল্লজ্জ ভাবে কি ব্যর্থ উমেদারীটাই না করিয়াছি! আহা, এইটা যদি প্রথমেই মাথায় আসিত, তবে প্রতিভার এই দুর্ব্বহ বোঝা বহিয়া বহিয়া কি মাতৃহারা সন্তানের মত এর দ্বার তার দ্বার ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত? যাক্, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা তো আর ফিরিবে না—ভাবিয়া, সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে উপস্থিত কার্য্যেই নিযুক্ত করিলাম।

প্রথম তিন চার মাস তো আমিই "অঞ্জলি"র অর্দ্ধেক ভরাট করিলাম। গল্পে কবিতায় সমালোচনায় আমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখিনী হইয়া উঠিল। যদু, গোপাল ও মাধব ইহারা আমার বিপুল ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্।

মাধব মাসে মাসে প্রাপ্ত কাব্য ও গল্প গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিতে লাগিল। যদু প্রতি সংখ্যায় ২।৩টি

করিয়া কবিতা দিয়া আমায় অশেষ ঋণপাশে বাঁধিতেছিল। আর গোপাল গল্পে হাত পাকাইতে লাগিল। রামকালী ও বিশ্বেশ্বর সবই লেখে। ইহাদের সকলের লেখাই আমি খুব ভাল করিয়া সংশোধন করিয়া দিতাম।

একবৎসর হইয়া আসিল। ছাপা কাগজ ছবি ও লেখা সবই প্রথম শ্রেণীর, তবু গ্রাহকের সংখ্যা আশানুরূপ হইল না। মাত্র ৬০০ শত গ্রাহক! বর্ষ-শেষে যদু হিসাব দেখাইল, আমার প্রায় সাত হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে!

বন্ধুরা বলিলেন, প্রথম বৎসর লোকসান অনিবার্য্য, দ্বিতীয় বর্ষে গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া খরচ নিশ্চয়ই কুলাইয়া যাইবে, তৃতীয় বর্ষ হইতে লাভ আরম্ভ।

সুতরাং আরও একবৎসর কাগজ চালাইলাম।

দ্বিতীয় বর্ষের চৈত্রসংখ্যা বাহির হইলে যদুর নিকট হিসাব চাহিলাম, যদু হিসাব দেখাইল। খরচ উঠা দূরের কথা, এবারেও পাঁচ হাজার টাকা লোকসান।

একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। নগদ টাকা ব্যাঙ্কেও আর বেশী নাই। তৃতীয় বৎসরও যদি এমনি হয়?

মাধব, যদু ও গোপালকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিলাম—এরূপ অবস্থায় আগামী বর্ষের কাগজ চালান উচিত কি না। এবং যদি চালাইতে হয় তো কি নূতন

উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, যাহাতে গ্রাহকও বাড়ে, কাগজও জনপ্রিয় হয়।

পরামর্শ অনেকই হইল। আমাদের চিরকাল যাহা হইয়া আসিতেছে তাহাই হইল। মীমাংসা কোন কথারই হইল না। জুয়া খেলার নেশার মত, "যদি এবার জিতি" এই আশায় আরও একবার চেষ্টা করিয়া দেখি বলিয়া কাগজ চালানই স্থির করিলাম। কারণ বাল্য-কালে কোনও কেতাবে পড়িয়াছিলাম Try Try Try again.

(৫)

সে দিন প্রাতে উঠিয়া বৈশাখ সংখ্যার জন্য একটি কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলাম। বেলা দশটার মধ্যেই কবিতাটি শেষ হইল। যদু কাছে থাকিলে, আজ সে এটি শুনিয়া নিশ্চয় আমার পদধূলির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত —কারণ কবিতাটি অতি চমৎকার হইয়াছিল। দুই তিন-বার পড়িলাম—পড়িয়া নিজেই মোহিত হইয়া গেলাম। ভক্তের অনুপস্থিতিতে নিজের পদধূলি নিজমস্তকেই দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

স্নানাহার সারিয়া, লেড্‌ল'র বাড়ী গেলাম পোষাক কিনিতে।

ফিরিবার পথে ট্রামে দেখি কয়েকজন নব্য যুবক বসিয়া সাহিত্য আলোচনা করিতেছে। আমার কাণটা

অমনি সেই দিকেই গেল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া তাহাদের সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলাম।

যে কথা শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বে হইলে হয়ত এমন করিয়া অকপটে-বলিতে পারিতাম না, কিম্বা তাহা ভদ্র সমাজে ঠিক উল্টাই বলিতাম; কিন্তু আর সে প্রবৃত্তি নাই। সত্য কথাই বলিব, কারণ, বঙ্গসাহিত্যে অমর হওয়ার আশা সম্প্রতি আমি নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়াছি।

তাহারা বলাবলি করিতেছিল যে আজকাল শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র "জননী", "সুধা" ও "চন্দ্রাতপ।" আর শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়াও আট দশ জনের নাম করিল। সে ফর্দ্দের মধ্যে না "অঞ্জলি"র নাম, না আমার নাম!

রাগে অভিমানে হতাশায় সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল দুর্ব্বৃত্তদের গাড়ী হইতে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিই অথবা গলা টিপিয়া ইহাদের ভবলীলা একেবারে সাঙ্গ করিয়া দিই। কিন্তু আবার ভাবিলাম, এরূপ করিলে বঙ্গসাহিত্যে তো দূরের কথা, বঙ্গদেশেও আমার জীবনের দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলাম।

অবশেষে একজন বলিল, "ওহে আবার দেখেচ? নবীন ভট্‌চায্যি 'অঞ্জলি' বলে একখানা কাগজ বের করেচে।"

অপর ব্যক্তি বলিল—"নবীন ভট্‌চায্যি আবার কে?

"আরে, তুমি নবীন ভট্‌চায্যিকে চেন না? সে যে একজন গিনিয়াস্—গিনিয়াস্।"

অপর একজন সজোরে হাঁটুতে এক চাপড় মারিয়া বলিল, "ওঃ হোঃ জানি, জানি। সে কুটুম্ব যে আমাদের জন্মাবার বহুপূর্ব্বে থেকে লিখ্‌চে! ট্র্যাশে এতবড় রাইটার আমি এপর্য্যন্ত আর একটিও দেখিনি! গিনিয়াসই বটে! বাবিশে তাহার অতুল প্রতিভা।"

দুইজনে তো প্রাণ ভরিয়া হাসিলই। আমার মত আরও যাহারা শুনিতেছিল, তাহাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও দন্তপংক্তি এই বন্ধুযুগলের অট্টহাস্যের সঙ্গে যুগপৎ বিকশিত হইতে দেখা গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "অঞ্জলির প্রোপ্রাইটার কে হে টুনু? গিনিয়াস্ মশায়ই না কি?"

টুনু নামক যুবা বলিল—"নামে—ঐ গিনিয়াস্‌ই বটে, কাযে যোদো সান্নেল।"

"সে কি রকম?"

"গিনিয়াস মশায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করে লোকসান দেন, আর যোদো সান্নেল সে টাকা নিয়ে গিয়ে নিজের বাক্স ভর্ত্তি করে।"

একজন প্রশ্ন করিল, "কোন যোদো সান্নেল? যে যোদো সান্নেল কবি?"

"আরে হাঁ হাঁ, যোদো কবি। সেই ত কাগজের ম্যানেজার, প্রেসেরও ম্যানেজার কি না।"

একজন বলিল, "যোদো এই নবীন ভট্‌চায্যির মস্ত এক ভক্ত না?"

প্রথমোক্ত যুবক হাসিয়া বলিল "হাঁ হাঁ। শুধু ভক্ত? অতি-ভক্ত, অতি-ভক্ত—ওটা কিসের লক্ষণ তা জান ত!"

"কি রকম, কি রকম!"

এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে ট্রামের বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। শাপে বর হইল।

হঠাৎ গাড়ী বন্ধ হইল বলিয়া এদিক ওদিকে একবার চাহিয়া টুনু বলিতে লাগিল—"যোদো ভারি ঝানু ছেলে! বুঝি বিনা মৎলবে অমনি চট্‌ করে একেবারে ভক্ত হয়ে পড়ল, ভাবচ? সেই ত আমার কাছে সব গল্প করে। তার উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমটায় কিছু হাত করা। তা দেখলে যে সে বড় কঠিন ঠাঁই। শেষে ভুজুং ভাজং দিয়ে ঐ কাগজ বের করালে, প্রেস কেনালে। প্রেস আর কাগজ থেকে দুবছরে সে প্রায় হাজার চার পাঁচ টাকা করিয়াছে। যদি এক টাকায় কিছু একটা কিনে আনে ত খাতায় লিখে রাখে দেড় টাকা। বাড়ী ফেঁদেছে, প্রায় শেষও হয়ে এল। তৃতীয় বছর অঞ্জলির 'লাভ' থেকে বাড়ী কমপ্লীট করবে বলেছে।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "ছি ছি; এটা কিন্তু যোদোর ভারি অন্যায়। মুখের সামনে প্রশংসা করে—অসাক্ষাতে তার সর্ব্বনাশের চিন্তা করা কি ভয়ানক অমার্জ্জনীয় অপরাধ বল দেখি! এবার যোদোর সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব---"

টুনু বাধা দিয়া বলিল—"কোনও ফল হবে না কোনও ফল হবে না! চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। আমিই কি তাকে বলতে কসুর করেছি? সে কি বলে জান? সে বলে-- বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ শাস্ত্রবাক্য' !"

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। গাড়ী কখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আমি লক্ষ্য করি নাই। যুবকেরা হ্যারিসন রোডের মোড়ে নামিয়া পড়িল।

বাড়ী আসিয়া দেখি, বৈশাখ সংখ্যার একগাদা প্রুফ রাখা রহিয়াছে। সেগুলা সজোরে ছিঁড়িয়া, জানালা গলাইয়া বাগানে ফেলিয়া দিলাম।

দারোয়ানকে ডাকিয়া হুকুম দিলাম—"যদুবাবু আনেসে ফাটক বন্দ্।"

হিসাবের বহিগুলি আনাইয়া, দুই তিন দিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। বিস্তর গলদ। চেক দিয়াছি, তাহা জমা করা নাই। এক খরচ দুইবার তিনবার করিয়া লেখা।

কাগজ বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রেস বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম।

একটি সুন্দরী ও ডাগর মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিয়া আবার সংসারী হইলাম। একটি পুত্রও হইয়াছে।

ভাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরেন্দ্র আজ বছর দেড়েক যে এত ঘন ঘন বাড়ী আসিতেছে, ইহাতে গ্রামের প্রবীণ লোকেরা মাথা নাড়িয়া বলিল—"নিশ্চয়ই উহার একটা গভীর দুরভিসন্ধি আছে।" তাহারা সুরেন্দ্রকে যথোচিত সাবধানও করিয়া দিল। কিন্তু সে বড় একটা গা করিল না। ক্ষুণ্ণ হিতৈষীগণ ক্রমে সুরেন্দ্রের উপর বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—"আমাদের কথা এখন শুন্‌চো না, শেষে পস্তাতে হবে কিন্তু। হরেন—যাকে তুমি মায়ের পেটের ভাই মনে কর্‌চ, সে কিন্তু তোমার শত্রু।"

সুরেন্দ্র একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"হরেন আমার ভাই, ছোট ভাই! মা যখন মারা গেলেন, তখন ও যে আমার কাছ ছাড়া একদণ্ডও কোথা থাক্‌তো না। আমি ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় বটে—তা হলেও আমার মনে হয়, আমি যেন ওকে মানুষ করেচি। ও আমার আর কি শত্রুতা কর্‌বে?"

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তামাক খাইবার জন্য খড়ের নুটি পাকাইতে পাকাইতে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"হরিচরণ উইল কর্‌বে, তা জান ?"

সুরেন্দ্র একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল—"তাতে আমার কি ? বাবা উইল কর্‌চেন্‌, আমরা তাঁর ছেলে, আমাদের নামেই ত' উইল কর্‌চেন্‌ ? এতে আর হরেন্‌ আমার শত্রু হলো কিসে ? যাক্‌গে চক্রবর্ত্তী জ্যাঠা, বাবা যা কর্‌বেন্‌ তাই হবে ! বাবা থাক্‌তে আমিই বা কে, আর হরেনই বা কে ?"

পাড়াগাঁয়ের মেঠো হাওয়ার মত সেখানকার লোকের হৃদয়গুলিও অবাধ এবং নির্ম্মল। তাহাতে কয়লা গুঁড়ির ভেজাল নাই। চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেন্দ্রের উক্তরূপ স্নেহপ্রবণ বিশ্বাসভরা উত্তরে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনি নিবারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গিয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া সুরেন্দ্রের অভিমতও জানাইলেন।

মুখুয্যে মশায় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিচরণ যে সুরেন্দ্রকে একবারে ফাঁকি দিবে, এ কথা তোমায় কে বল্‌ল ?"

"হরেন্দ্রর স্ত্রীই এ কথা নদীর ঘাটে আমার স্ত্রীকে বলেছে।"

"হরেন্দ্রর স্ত্রী কি বলেছে—বল তো শুনি আগে !"

চন্দ্র বলিল—"হরেন্দ্রের স্ত্রী বলেছে যে, একে তার শ্বশুরের বয়স হয়েছে, তাতে তাঁর শরীরও ভাল নেই ; এই সব কারণে হরেন্দ্রের ইচ্ছা যে যা-কিছু আছে বাপ থাকৃতে থাকৃতে তার একটা বিধি ব্যবস্থা হয়ে যায়। নৈলে বাপের অবর্ত্তমানে ঐ নিয়ে শেষে আবার কোনও গোলযোগ ঘটে—সেটা তো আর ভাল নয়! ঘরে আবার ঐ বিধবা মেয়ে ক্ষ্যান্ত রয়েছে—বাপ যদি নিজে কিছু দিয়ে যায়, তা হলে ও বেচারীও কিছু পায়! এ কথায় আমার স্ত্রী বলেছিল—সে তো ভালই। দুই ভাইও যেমন কিছু কিছু পাবে, বোনটিরও তো তেমনি কিছু পাওয়া উচিত। মা মরে যাওয়ার পর, ঐ তো বুক দিয়ে এতদিন সংসারটা খাড়া রেখেছে। এতেই হরেন্দ্রের স্ত্রী বলেছে—যে তার শ্বশুরের ইচ্ছে নয় যে, তিনি তাঁর বড় ছেলেকে কিছু দেন্।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেশ অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেখ চন্দর, আমার মনে হয়, এ সব ঐ ক্ষ্যান্ত ছুঁড়িরই কারসাজী। হরা ত জন্ম-কুচুটে, কিন্তু সে যে এতটা করতে সাহস করবে, আমার তো তা বিশ্বাস হয় না।"

"না দাদা, তুমি বুঝ্তে পারচনা। দুজনে মিলেই ওরা এ কায করচে। হরার তেজটা তো তুমি আজকাল দেখ নাই। ওরে বাপ্‌রে তেজে মট্‌মট্ করচে। বাইশ টাকার নায়েবী করে,' মাটিতে আর তার পা পড়ে না। আর

কি-সমস্ত রাজা উজীর মারা গল্প—শুন্‌লে একবারে পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে যায়।”

“বলো কি ?”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আরও উত্তেজিত হইয়া, একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গা টিপিয়া বসিতে লাগিলেন—“হাঁ দাদা, তবে আর বল্‌চি কি ? হরা বাড়ী এলে, সুরেন্ ভাইয়ের জন্যে একবারে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়; কোথায় কি হরেন ভাল বাসে—এই সব যোগাড়যন্ত্র করতে সুরেনের নাইবার খাবার পর্য্যন্ত অবকাশ থাকে না। বড় ভাই হয়ে ঠিক যেন চাকরের মতন খাটে, আর হরেন্ সেই বড় ভাইকে কি না সেদিন আমার সাম্‌নে বল্‌লে—‘তুমি একটা গাধা।’ সুরেন্ মুখটি নীচু করে’ চলে গেল। আমি থাক্‌তে পার্‌লাম না, হরেনকে একটু বক্‌লাম—সেই থেকে বাবু আমার সঙ্গে আর কথাই কন্ না।”

“বলো কি চন্দোর ?”

“কি বল্‌বো দাদা ? সুরেন্‌কে বল্‌তে গেলাম সে বল্‌লো—ও ছেলে মানুষ, ওর কথা কি ধর্ত্তব্য ? না কি গাধা বল্‌ল বলে আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল ?”

“আচ্ছা তুমি একবার দত্তমশায়কে খবরটা দিয়ে রাখ। আজ সন্ধ্যায়—না আজ সন্ধ্যায় নয়—আমার একটু কথা

আছে—কাল সকালে চল আমরা সবাই গিয়ে একবার হরিচরণকে বলিগে।”

চক্রবর্ত্তীর মুখে সহানুভূতির পবিত্র আলোক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন—আমরা থাকৃতে গাঁয়ে ভাল মানুষের উপর কোনও অত্যাচার হতে দেব না! তা হোলে লোকে বল্‌বে, গাঁয়ে কি কেউ মানুষ ছিল না?”

পরদিন প্রভাতে গ্রামের মাতব্বর রাম দত্ত, নিবারণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও দীনু মণ্ডল হরিচরণের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। শুনিল অদ্য প্রত্যূষেই হরেন্দ্রের সঙ্গে হরিচরণ মহকুমায় গিয়াছেন। সুরেন্দ্র বিগত সন্ধ্যা হইতে বাড়ী নাই, হরিশ বাঁড়ুয্যের শব-সৎকার করিতে গঙ্গাতীরে গিয়াছে। এ দিকে এই সকালে তাহার স্ত্রী একটী কন্যা প্রসব করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিচরণ ভট্টাচার্য্য উইল করিয়া ফিরিলেন—এ সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। কি যে উইল হইল, তাহা কিন্তু হরিচরণ গোপন করিলেন—লোকের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি তাহা খোলসা করিয়া কাহাকেও বলিলেন না।

যে কায লোকে যত গোপন রাখিতে চেষ্টা করে, সে কায তত শীঘ্রই প্রকাশ পায়—বিশেষতঃ অন্যায় কায।

সুরেন্দ্রের যাহারা হিতৈষী, তাহারা মহকুমার রেজেষ্ট্রী আফিস হইতে খবর লইয়া জানিল যে, হরিচরণ যথাসর্ব্বস্ব স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিয়া দিয়াছেন—কেবল পাঁচ বিঘা জমি ও যৎসামান্য পিতল কাঁসার জিনিষ তাঁহার বিধবা কন্যা শ্রীমতী ক্ষান্তমণি দেব্যার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দান করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার অবাধ্য প্রভৃতি কারণে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে উক্ত সুরেন্দ্রনাথকে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার অবর্ত্তমানে বংশপরম্পরাসূত্রে ভোগ-দখল করিতে অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

এই অদ্ভুত উইলের কথা শুনিয়া গ্রামসুদ্ধ লোকে এক-বারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল —যে এইবার সুরেন্দ্র মহা হুজ্জুৎ বাধাইবে। একে সে একগুঁয়ে লোক, তাহাতে আবার দু'বেলা দু'মুঠো ভাতেও যখন সবাই তাহাকে বঞ্চিত করিল, তখন এবার সে আর চুপ করিয়া থাকিবে না।

লোকে অধীর উৎকণ্ঠায় দুইদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল; কিন্তু সুরেন্দ্রের কোন ভাবান্তরই লক্ষিত হইল না। সে যেমন বেলা তৃতীয় প্রহরে যজমানদের বাড়ী পূজা সারিয়া, বামহস্তে নৈবেদ্যের ছোট ছোট রেকাবিগুলিকে উপর উপর রাখিয়া গামছায় ঝুলাইয়া, খালি পায়ে খালি গায়ে

বাড়ী ফিরিত—তেমনই ফিরিয়া আসিতেছে। মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে, চাহনিটি আগেকার মতই স্নিগ্ধ, শান্ত, নির্ভীক, এবং নিশ্চিন্ত।

লোকে ভাবিয়াছিল, পিতার এই কার্য্যের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতে, দুঃখ নিবেদন করিতে সুরেন্দ্র নিজেই তাহাদের দ্বারস্থ হইবে; কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন লোকের বিস্ময় ও কৌতূহল আর বাধা মানিল না।

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনাইয়া বলিলেন—"বলি, তোমার মতলবখানা কি বল দেখি? এত বড় যে একটা কাণ্ড হল—আমাদিকে তা' কি জানাতে নেই? আমরা কি তোমার শত্রু?"

সুরেন্দ্র ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন জ্যাঠা-মশায়, কি কাণ্ড হয়েছে? আপনি কি বল্‌চেন, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না!"

"চিরকালই কি খোকাটি হয়ে থাক্‌বে? 'কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না'। তোমাকে সেদিন আমি বলেছিলাম কি না যে, হরা তোমার শত্রু! তখন যে ভাইয়ের পানে বড্ড টান দেখিয়েছিলে। এখন? খুব ভাইয়ের কায করেছে, নয়?"

সুরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল—বলিল—"এই কথা জ্যাঠা মশায়? এতে হয়েছে কি? আপনি কি মনে করেন যে, বাবা, হরেন্‌ সবাই আমায় বল্‌বে—তুমি

তোমার ছেলেপিলে নিয়ে বেরিয়ে যাও? তাই কখনও পারে? এ উইলের কথা তো আমি পরশু দিনই শুনেছি।"

"তুই যে অবাক কর্‌লি সুরেন্‌! তুই ভাবচিস্‌ কি? তোকে যদি না তাড়াবে, তোকে যদি না ফাঁকি দেবে—তবে এ সব উইল ফুইল করবার দরকার ছিল কি?"

সুরেন্দ্র একটু চিন্তা করিল। তাহার মুখমণ্ডলে হঠাৎ চিন্তার একটা কালো ছায়া আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"এখন আজ যদি তোকে ওরা বের করে দেয়, তা হ'লে তুই ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবি? খাবিই বা কি?"

সুরেন্দ্র আরও চিন্তিত হইয়া পড়িল। কুঞ্চিত ভ্রূযুগের নীচে সুরেন্দ্রের বিস্ফারিত আয়ত চক্ষুদুটির দৃষ্টি নির্নিমেষে ভূমিতে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব। সুরেন্দ্র একটু চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে আমি কি কর্‌বো?" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আদালত ভিন্ন এর মীমাংসা আর কে করবে?"

কথা শেষ হইতে না হইতেই সুরেন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আদালত? বাপের নামে, ছোট ভাইয়ের নামে,

বড় দিদির নামে আদালত? এ আমি পারবো না কপালে যা থাকে তাই হবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাকুমা যাইবার তিন দিন আগে হইতেই হরিচরণের যে জ্বর আসিয়াছিল—সে জ্বর এখনও ছাড়ে নাই। গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা অপেক্ষা করিয়াছিল যে, হরিচরণের জ্বর ছাড়িলেই তাহারা তাহাকে ধরিয়া যে কোনও উপায়ে এ উইল রদ্ করাইবে। সুরেন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে, তাহাকে এমন করিয়া ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে তাহারা দিবে না। কিন্তু যখন সবাই শুনিল যে, বৃদ্ধের অসুখ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে, তখন সকলে একদিন রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে ভট্টাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসা পথ্যাদির প্রকরণ প্রভৃতি নানা বাক্যালাপের পর নিবারণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"দেখ হরি ভায়া, তুমি উইলটা এই সময় বদ্‌লিয়ে দিয়ে যাও। এটা কি তোমার ঠিক হয়েছে? তোমাকে তো লোকে ছি ছি করছেই, তার সঙ্গে আমরাও যে কেউ মুখ দেখাতে পারচি না।"

কক্ষে হরেন্দ্র একটা মোড়ায় বসিয়া একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া ঘৃণাভরে একবার

অভ্যাগতদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় কাগজ পাঠে প্রবৃত্ত হইল।

হরিচরণ নিরুত্তর। চক্ষু বুজিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে যেমন শুইয়াছিলেন, তেমনিই শুইয়া রহিলেন।

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিল—"কি ভাই শুনচ'? মুখুয্যে মশায় কি বল্লেন?"

হরিচরণ মুদ্রিত নেত্রেই কহিল—"তা কি করব বল? আমায় –"

হরেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল—"দেখ্চেন, ওঁর জ্বরে হুঁস্ নেই, এখন আর বিরক্ত নাই বা কর্লেন?"

চক্রবর্ত্তী ও রাম দত্ত উভয়েই গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"তুমি চুপ করে' থাক, নয় ঘর হ'তে বেরিয়ে যাও। যে কায করেচ, গলায় দড়ি দিয়ে মর গে!"

হরেন্দ্র দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কি, আমি বেরিয়ে যাব? এ বাড়ী আমার তা জান? বেরোও বল্‌চি, বেরোও আমার বাড়ী থেকে!"

দত্ত মহাশয় ধীরভাবে বলিলেন—"কার সঙ্গে কথা কইচ জান? এ বাড়ী তোমার নয়, এ বাড়ী ভট্‌চাজ মশায়ের। তা ছাড়া, কার মাটিতে এ বাড়ী জান? আমি ইচ্ছে কর্‌লে এ বাড়ীতে ভাগাড় বসাতে পারি, তা জান?" বলিয়া দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "এখুনিই ঘর থেকে বেরোও।"

হরেন্দ্র মন্ত্রাহতের ন্যায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

হরিচরণ এই বচসার সময়ে একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন।

দত্ত মহাশয় কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন —"ভট্‌চাজ মহাশয়, এর জন্যে আপান চিন্তিত হবেন না। একটু কেবল ধমক্‌ দিয়েছি। হাঁ, এখন বলুন, এ কায আপনি কর্‌লেন কেন?"

হরিচরণ ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। গ্রামের জমিদারের কাছে এরূপ একটা অন্যায় আচরণের সন্তোষপ্রদ কৈফিয়ৎ দিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া—একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিলেন না। হরিচরণের মাথা ঘুরিতেছিল, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হইতেছিল দেখিয়া নিবারণ বলিলেন—"ও কথা না হয় থাক্‌গে, ও আমরা সবই বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন এ উইল আপনি বদ্‌লে সুরেন্‌কে তার ন্যায্য প্রাপ্য দিতে রাজী আছেন ত?"

হরিচরণ তাঁহার ব্যারামের যন্ত্রণা অপেক্ষা উত্তরের জন্য অনেক বেশী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 'হাঁ' 'না' কি যে বলিবেন মাথায় কিছুই যোগাইল না। এই অশান্তি হইতে আশু নিষ্কৃতির জন্য তিনি বলিলেন—"আচ্ছা বাবু,

আমি একটু সুস্থ হলেই এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে'—যা হয় তাই কর্‌ব।"

চন্দ্র বলিল—"কি আর এমন তোমার ন'শো পঞ্চাশ-খানা তালুক মুলুক আছে যে, তার জন্যে এত সব পরামর্শের প্রয়োজন? এই যে কেলেঙ্কারিটা করে' এলে, ক'জনকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ভাই?"

নিবারণ, চন্দ্রকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ধর', ঈশ্বর না করুন্, যদি ন-ই বাঁচ? অনিশ্চি বয়সও তো হয়েছে। তখন ও বেচারীর কি দশা হবে?"

হরিচরণ এতক্ষণ একটা বালিশে ঠেশ্ দিয়া বসিয়া-ছিলেন, হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেলেন। সকলে মিলিয়া কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করাইলেন; কিন্তু কোন কথারই কিছু শেষ নিষ্পত্তি সে দিন আর হইল না।

সকলে চলিয়া গেলে হরেন্দ্র ক্ষান্তমণিকে ডাকিয়া কহিল—"দেখ্‌চ দিদি, বদ্‌মাইসের কাণ্ডখানা দেখ্‌চ? গাঁয়ের যত সব মজামারা বজ্জাতদিকে দিয়ে ওকালতী করানোর ধুম দেখ্‌চ?"

ক্ষান্ত দক্ষিণ হস্তের তালুটি হরেন্দ্রের সম্মুখে পাতিয়া নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে ছল-ছল চক্ষে কহিল—"ভাই, তুমিই দেখ, তুমিই দেখ। তুমি তো বাড়ীতে থাক না—তুমিই

দেখ। আমার দেখে দেখে হাড় মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। মনে হয় আফিং খেয়ে মরি।”

“তুমি সবুর কর দিদি। দেখ তো, আমি এর একটা হেস্ত নেস্ত না করে’ ছাড়্‌চি না। আজ কালের মধ্যেই করে’ ফেল্‌চি, তুমি দেখে নিও।”

এমন সময়ে যেমনি সুরেন্দ্র কোঁচার কাপড়ে করিয়া চারিটি জীয়ন্ত মাগুর মাছ লইয়া উপস্থিত হইল, অমনি ক্ষান্ত একেবারে রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—“এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিলি রে হতভাগা ?”

সুরেন্দ্র হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল—“দিদি একেবারে চব্বিশ ঘণ্টাই আগুন! হরেন্‌ মাগুর মাছ ভালবাসে, তাই গবাইদের পুকুরে এই মাছ ধর্‌তে গিয়েছিলাম।”—

হরেন্দ্র বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে ক্ষান্তকে কহিল—“দিদি, ও মাছ আমি খাব না।” বলিয়া স্থানত্যাগ করিল।

সুরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কেন ভাই ?”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই যে হরিচরণের মূর্চ্ছা হইল, সেই মূর্চ্ছাই তাঁহার কাল। সন্ধ্যার পর হইতেই জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িল। জ্বরের ঘোরে সারা রাত্রি কত কি অসম্বদ্ধ বকিয়া বকিয়া প্রাতে যেমন একটু নিদ্রাবিষ্ট হইলেন, অমনি

সারারাত্রি জাগরণক্লান্ত সুরেন্দ্রের দেহখানি পিতার শয্যা-পার্শ্বে মেঝের উপর তন্দ্রায় ঢলিয়া পড়িল।

তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল। তপনদেবের প্রচুর আলো পল্লীগ্রামের অবাধ পথে, গাছে, শাখায়, পাতায়, লতায়, জানালায় ঠিকরিয়া পড়িয়া ধরণীকে শিশুর শুভ্র হাসির মত শোভাময় করিয়া তুলিয়াছিল।

হঠাৎ গোলমালে এবং উচ্চ ক্রন্দনধ্বনিতে সুরেন্দ্র জাগিয়া উঠিল। দেখিল, হরেন্দ্র সতীশ এবং কান্ত তিন জনে ধরাধরি করিয়া মুমূর্ষু হরিচরণকে নীচে নামাইতেছে; সুরেন্দ্র চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাশ্রুনেত্রে পিতাকে অঙ্গিনায় তুলসী-মঞ্চতলে শোয়াইল। অল্পক্ষণ পরেই হরিচরণ তাঁহার ষাঠ বৎসরের পরিচিত সংসারের সহিত তাঁহার অকর্ম্মণ্য প্রাণহীন দেহটিকে রাখিয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পিতার সৎকার শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার পরেই সুরেন্দ্রের জ্বর আসিল। বাটী পৌঁছিয়াই সে লেপ মুড়ি দিল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"সুরেন্দ্র যে এই ১৫টা উপরি-উপরি রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেবা করিয়াছে, দিনেও একটু বিশ্রাম করিতে পায় নাই—তার উপর এই দুর্ভাবনা ও মনকষ্ট, তাই নাড়ি একটু চঞ্চল হইয়াছে। ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই। এ জ্বর তিন দিন মাত্র থাকিয়াই বিরাম হইবে।

হরেন্দ্র তবু আশ্বস্ত হইতে পারিল না। চুপে চুপে গিয়া ক্ষান্তকে জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, কেমন বুঝ্‌চ'? আবার কি বিপদে পড়্‌বো নাকি?"

ক্ষান্ত তখন কাপড় চোপড় কাচা ও ঘর ধোয়া প্রভৃতি কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল; তাই সে তাড়াতাড়ি দু'এক কথায় উত্তর দিল—"তা ভাই, সে বড় আশ্চর্য্য নয়, যে পোড়া কপাল আমাদের।"

হরেন্দ্র বলিল—"তাই তো বল্‌চি, যে শত্রুর পুরী হয়েছে, যদি কিছু হয় তো শালারা বলবে মেরে ফেলেচে; আর অমনি হাতে দড়ি।"

"মিছে নয় ভাই, যা' বলেচ'। তা' হওয়াও কিছু আশ্চয্যি নয়! আচ্ছা, এই হাতের কাযগুলো সেরে পরামর্শ কর্‌চি। তুমি একটু দাঁড়াও।"

দুই দিন ধরিয়া পরামর্শ হইল। তাহাতে এই স্থির হইল যে, সুরেন্দ্রকে সপরিবারে এ বাটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেই হইবে। ইহাতে কালবিলম্ব করিলে চলিবে না। আর এই কথা জ্ঞাপন করার ভার ক্ষান্ত নিজেই গ্রহণ করিল।

চতুর্থ দিন প্রভাতে সুরেন্দ্র জ্বরে বেঘোর হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষান্তমণি তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—"ওরে সুরো, শুন্‌চিস্‌—আর অমন ঠাট করে' পড়ে থাক্‌লে হবে না। নে নে ওঠ্‌।"

সুরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কাতর দৃষ্টিতে দিদির মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আমি কি অমনি সাধ করে পড়ে' আছি, দিদি? বড় কাবু না হ'লে আমি পড়ে' নাই। একবার খোঁজ ও তো নাও না, তার আর কি বুঝ্‌বে?"

"ঢং দেখে বাঁচি না। অমন মালগোট্টা শরীর—হয়েছে কি যে সারাদিন খোঁজ তল্লাস কর্‌তে হবে?" ক্রমে স্বর নামাইয়া বলিল—"তা সে যা' হয়, হোক্‌গে; এখন যা' বল্‌তে এসেচি শোন,—আমি কাযের মানুষ কায কামাই করে দাঁড়াতে পার্‌চি না। হরেন্ বল্‌চে যে তোমাদের আর এ বাড়ীতে সে থাক্‌তে দেবে না!"

কথাটা শুনিয়া সুরেন্দ্র একবার আঁৎকাইয়া উঠিল। প্রথমটা সে ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মাথার ভিতরে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার মত বোঁ বোঁ করিয়া একটা বিকট শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। যখন সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল—তখন তাহার মনে হইল যেন তাহাকে শত শত ভীমরুলে দংশন করিতেছে। অভিমানে অপমানে দুঃখে রোগে যাতনায় সুরেন্দ্র একবারে নিরুত্তর নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

নিরুত্তরের শানে আদেশকে আরও তীক্ষ্ণতর করিয়া ক্ষান্ত প্রশ্ন করিল—"চুপ করে' রৈলি যে? কখন যাবি বল? আমার অনেক কায রয়েছে। আমি কি দাঁড়াতে পারি?"

এবার আর সুরেন্দ্র থাকিতে পারিল না। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। বড় বড় উত্তপ্ত চোখের জলের ফোঁটাগুলি তাহার রুগ্ন কপোল আর্দ্র করিয়া বিছানায় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলিল—"কখন যাব? দিদি কোথায়ই বা যাব? খাবই বা কি? একে এই দুঃসময়, নানান্ দিকে ব্যতিব্যস্ত? কে জায়গা দেবে? এই অশৌচ, আমার এই অসুখ, ওদিকে আঁতুরে রোগী, দশ-দিনের কাঁচা ছেলে, ছোট ছোট তিনটি মেয়ে; এ অবস্থায় কোথা যাব দিদি?"

ক্ষান্তর মন একটু নরম যদিও হইল, তবুও সে এ রুগ্ন নিরুপায়কে শ্লেষবিদ্ধ করিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিল না। বলিল—"সে কি, তোমার এত হিতৈষী বন্ধু? ঐ চন্দোর চক্কোবত্তী, নিবারণ মুখুয্যে, রাম দত্ত, যারা তোমার জন্যে অনাহুত ওকালতী কর্‌তে আস্‌তে পারে, আর তারা তোমায় একটু জায়গা দিতে পারে না? কথায় তারা এত দরদ জানায়, আসলে কিছু কর্‌বে না—তাও কি হয়?"

সুরেন্দ্র বুঝিল, তাহাকে বাড়ী ছাড়িতেই হইবে। তবুও বলিল "এই আজ মোটে চারদিন বাবা গেলেন, এখন যদি তোমরা আমায় তাড়িয়ে দাও, তা হলে বড় কেলেঙ্কারী হবে। তার চেয়ে বাবার কাযটা ভাল ভালয় হয়ে যাক্, আমার জ্বরটাও সারুক, এর মধ্যে যা' হয় মাথা গুঁজবার

একটা জায়গাও করে নি'—তারপর আমি আপনিই না হয় যাব। এখন গেলে যে লোকে বড় নিন্দে কর্‌বে ?”

“হরেন্ বলে, সে নিন্দে হয়, তার হবে। তার জন্যে তোমার ভাবনা কি ?”

সুরেন্দ্র ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—“কি ? হরেনের নিন্দে হলে আমার কি ?”

দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া হরেন্দ্র সব শুনিতেছিল। বেগে সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—“আর তোমার ভালবাসা দেখাতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে। এ বাড়ী আমার তুমি এই মুহূর্ত্তেই বেরোও।”

বাহিরে আষাঢ়ের মেঘমন্দ্রিত আকাশে তখন বাদলে বাওরে তুমুল কল কোলাহল চলিতেছিল—সুরেন্দ্র নীরবে একবার বাতায়নপথে বহিঃপ্রকৃতিকে দেখিয়া লইল। মাথার গোড়ায় একগাছি বাঁশের লাঠি ছিল, তাঁহাতে ভর দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—“বড় বৌ, ছেলেদিকে নিয়ে আমার সঙ্গে এস।” বড় বৌ কাঁদিয়া উঠিল—মেয়ে তিনটি মার কাছেই বসিয়া ছিল, তাহারাও কাঁদিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র কঠোর কণ্ঠে বলিল—“এসো—দেরী করো না, বল্‌চি। আমার সেই ছাতাটা আমায় দাও।” জ্বরে তাহার চক্ষু জবার মত লাল ছিলই এখন যেন আরও ভয়ানক দেখাইতে লাগিল।

অঘোর বাদলে সুরেন্দ্র সেই শতছিদ্র ছাতাটি মাথায়

দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রামের পথে বাহির হইল। পশ্চাতে, সদ্যোজাতা শিশুকন্যাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া রোরুদ্যমানা পত্নী ও কন্যাত্রয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাটি হইতে বাহির হইয়া সুরেন্দ্র বরাবর রামদত্তর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক যথাযথ সমস্ত ব্যাপার জানাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন যে লক্ষ্মী ময়রাণীর দরুণ ঘরখানাতে এখনি সুরেন্দ্রের জন্য স্থান করিয়া দেওয়া হউক।

লক্ষ্মী এই ঘরখানি বন্ধক রাখিয়া দত্তমহাশয়ের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল ;—কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিবার পূর্ব্বেই সে ইহধাম পরিত্যাগ করে। তাহার আর কোন ওয়ারিশ না থাকায় এ ঘরখানি এখন দত্ত মহাশয়েরই সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দত্তমহাশয় বলিলেন—"এ ঘরখানি মায় মাটি সুদ্ধ আমি তোমায় দান কর্‌লাম, সুরেন্! পরে রীতিমত লেখাপড়া করে' দেব এখন। আপাতত ওখানে গিয়ে দাঁড়াও গে তো?"

সুরেন্দ্র জ্বরে ও ঠাণ্ডায় কাঁপিতে কাঁপিতে কি বলিতে যাইতেছিল, দত্ত মহাশয় তাহাকে বাধা দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈজস-পত্র খাদ্য প্রভৃতি সমস্তই হাজির হইল।

হরেন্দ্রের এ নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার কাহিনী গ্রামে রাষ্ট্র হইতে দেরী লাগিল না। ঈদৃশ পৈশাচিক কার্য্যের প্রতিশোধ দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ গ্রামের একদল লোক প্রস্তুত হইয়া দত্তমহাশয় ও সুরেন্দ্রের আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইল। দত্ত মহাশয় তাঁহার বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারে সকলকে স্থির হইতে ইঙ্গিত করিলেন। সুরেন্দ্রও অনুরোধ করিল যেন হরেন্দ্রর উপর কেহ কোনও রূপ অত্যাচার না করে। অবমানিত ভ্রাতৃস্নেহকে সুরেন্দ্র এইরূপে রাজাধিরাজের মণিমুকুটে ভূষিত করিয়া দিল।

সুরেন্দ্রের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, আশ্রয় পাইয়াছে, গ্রামের সর্ব্বসাধারণে তাহাকে সাহায্য করিতেছে, লোকে বলিতেছে যে চাঁদা তুলিয়া সুরেন্দ্রের কন্যার বিবাহ দিয়া দিবে, রামদত্ত ইহারই মধ্যে দশটাকা বেতনে তাঁহার সেরেস্তায় সুরেন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়াছেন—ইত্যাদি সংবাদ হরেন্দ্র যতই শুনিতেছিল, ততই সে সুরেন্দ্রের প্রতি বেশী বেশী হিংসাযুক্ত হইতেছিল। গ্রামের লোকের উপর সে তো চটিয়া আগুন। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া সে যাহাকে পথের ভিখারী করিতে চায়, লোকে কেন তাহাকে আদর করিয়া তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিবে? সুরেন্দ্র নীরবে সমস্ত লাঞ্ছনা বহন করিতেছে, সে যে বাধা দিতেছে না—হরেন্দ্র ভাবিল ইহা কেবল ভয়! তবু সে তাহাকে

আশানুরূপ জব্দ করিতে পারিতেছে না। হরেন্দ্র আপনার এই ক্ষমতাদৈন্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল।

শ্রাদ্ধের সময় যখন নাপিত, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ কেহই তাহার গৃহে পদার্পণ করা দূরে থাকুক্, আহ্বানই গ্রহণ করিল না—তখন হরেন্দ্র ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাহার ব্যর্থ-প্রয়াসের ভস্ম-স্তূপের উপর আত্মহত্যা করিতেও কষ্ট বোধ করিল না। কিন্তু সে ক্ষমতা তাহার নাই। তাহার ইচ্ছা হইল—এই মুহূর্ত্তে গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিশ্বদাহী আগুন জ্বালাইয়া দেয়—ইহাও তাহার সাধ্যাতীত।

সুরেন্দ্রের গৃহে পিতৃশ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন। গ্রাম-সুদ্ধ লোক তাহার বাড়ীতে কাযে অকাযে কারণ অকারণে ঘুরিতেছে, হুকুম চালাইতেছে, কায করিতেছে, গোলমাল করিতেছে, নূতন ছোট ডাবা হুঁকা হাতে করিয়া মুরুব্বীয়ানা করিতেছে—অর্থাৎ এ যেন গ্রামবাসী সকলেরই পিতৃশ্রাদ্ধ। হরেন্দ্রবাবু কলিকাতায় থাকে, মাইনর চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, কাযেই শিক্ষিত, জুতা পায়ে না দিয়া রাস্তায় বাহির হয় না, ঘড়ি দেখিয়া সময় নিরূপণ করে—সে এ অসভ্য গ্রাম্য বর্ব্বরদের খোষামোদ করিতে পারে না—তাই সে সেই দিনই কলিকাতা রওনা হইল। শ্রাদ্ধ সেইখানেই করিবে।

তিন চারি মাস পরে হরেন্দ্র পরিবারবর্গকে পুনরায়

গ্রামে রাখিয়া কলিকাতা ফিরিয়া গেল। সতীশের এবার তাহার ছোট মামার—সম্প্রতি মামাবাবুর—অধীনে মাসিক ছয় টাকা বেতনে একটি চাক্‌রী হইয়াছে বলিয়া, সে আর আসে নাই।

ক্ষান্তমণির মনোভাবটা তবু হরেন্দ্রের উপর তেমন প্রসন্ন নহে—এটা অনেকেই লক্ষ্য করিল। বিশেষতঃ গ্রামের মহিলামহলে ইহা লইয়া বেশ একটা কাণাঘুঁসা চলিতে লাগিল।

ক্ষান্তমণির প্রাণপণ সহযোগিতায় হরেন্দ্র সুরেন্দ্রকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে যে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, এজন্য ক্ষান্তর সঙ্গেও মহিলারা ভাল করিয়া মিশেন না, কাযেই আসল ব্যাপারটা কেহই ভাল জানিল না। যে দিন হরেন্দ্রের স্ত্রীর সহিত ক্ষান্তর একটি ছোটখাট কলহ হয়, সেই দিনই সকলে টের পাইয়াছে যে ক্ষান্তমণির বহুদিন সঞ্চিত পাঁচশো খানি রৌপ্যমুদ্রা ছিল, তাহার উপর হরেন্দ্রের চিরকাল একটা আকর্ষণ ছিল—সম্প্রতি হরেন্দ্র সেগুলিকে আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সতীশকে ভাল চাকরী করিয়া দিবে, ক্ষান্তকে তীর্থ করাইবে, আমরণ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সমস্ত ব্যয় বহন করিবে, প্রভৃতি মধুর বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া ক্ষান্তমণি ছোট ভাইয়ের নিকট সেই রাশিপ্রমাণ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে—তাহার যে পুনরুদ্ধার কখনও হইবে এ আশা অতি অল্প বলিয়া সময়

সময় ক্ষান্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া থাকে। ইহাতেই গ্রামে আসল কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দুই ভাই দুই ঠাঁই হইয়া এক রকম করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে। সুরেন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা যে সে গিয়া হরেন্দ্রের সঙ্গে মিট্‌মাট্‌ করিয়া আসে, কিন্তু সকলেই তাহার এ মতের বিপক্ষে বলিয়া সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই।

গ্রামে আসিলে হরেন্দ্র নিজেও কোথাও বাহির হয় না, অথবা তাহার নিকটও কেহই যায় না—লোকের মনে এখনও তার ভাইয়ের প্রতি অত্যাচারের স্মৃতি জাগরূক। কখন কখন তাহার ইচ্ছা হইয়াছে কোথাও গিয়া দুই দণ্ড বসে, বা কাহারও সহিত দুইটা সুখ দুঃখের আলাপ করে,—কিন্তু তাহাকে যে সকলে ঘৃণা করে, কেহই তাহাকে নিজের পাশে বসাইবে না—ভাবিতে ভাবিতে রাগে তাহার শিরাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। এই জন্য সুরেন্দ্রের নাম পর্য্যন্ত তাহার সহিত না। পূজার ছুটি ছাড়া হরেন্দ্র বাড়ী আসাই প্রায় পরিত্যাগ করিল।

হরেন্দ্র বাটি আসিলে সুরেন্দ্রের খুবই ইচ্ছা হইত একবার তাহার নিকট যায়, কিন্তু কেহই তাহাকে যাইতে দেয় না। বিশেষত দত্ত মহাশয়ও এমন ভাইয়ের সঙ্গে

আলাপ করাতে যখন নারাজ তখন আর সুরেন্দ্র যায় কি করিয়া? তবুও পথে ঘাটে কোথাও দেখা হইলে সুরেন্দ্র ছোট ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। হরেন্দ্র ইহাকে অন্যরূপ ভাবিয়া অনেক সময় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত—তাহার ভয়, কি জানি যদি কিছু চাহিয়া বসে। সুরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনেই কাঁদিত।

এবারও হরেন্দ্র বাড়ী আসিয়াছে। পথে দুজনের সাক্ষাৎ-হওয়ায় সুরেন্দ্র স্বভাব হাসিতে অভিষিক্ত করিয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল—"এই যে, হরেন্ যে, কবে এসেছ ভাই?"

হরেন্দ্র দাঁত মুখ খিঁচাইয়া অত্যন্ত রূঢ়স্বরে কহিল—"কেন তোমার কিছু চাই টাই? যা মতলব, খুলে বল।"

সুরেন্দ্র আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, হতাভিমানে মুখ নামাইয়া চলিয়া গেল! সুরেন্দ্র আজ অত্যন্ত ব্যথিত হইল, মর্ম্মান্তিকরূপে অপমানিত বোধ করিল। সে কি করিয়া বুঝাইবে যে, সে মাসিক দশটাকা বেতনে ও নৈবেদ্যের চাউলে রাজার হালে আছে, তাহার কোন অভাবই নাই। যজমানেরা এখন তাহাকে সিধায় বেশী বেশী চাউল দেয়, দুই আনার স্থলে চারি আনা দক্ষিণা দেয়—তাহাতে তাহার অবস্থা খুবই সচ্ছল, একথা সুরেন্দ্র তাহার মদান্ধ নির্ব্বোধ ভাইটিকে কি করিয়া বুঝায়? অথচ এত বড় একটা অপমানও

সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। 'কিছু চাই?' কখনও কি সে কিছু চাহিয়াছে? তাহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইল, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিল, কণ্ঠের নীচে ভাণ্ডভরা বিষ ফেনাইয়া উঠিল—ফিরিয়া দেখিল যখন, তখন তাহার ভাই বহুদূর চলিয়া গিয়াছে,—এত দূর যে আর ডাকিয়া সে বিষ নিক্ষেপ করিতে গেলে তাহাতে ফল তো হইবেই না, হয় ত পরিহাসের মত গায়ে লাগিয়া ঝরিয়া পড়িবে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সুরেন্দ্র নিজের মনের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিল। এইদিন হইতে আর যাহাতে দুইজনে সাক্ষাৎ না হয়, তারজন্য সেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিল।

আশ্বিনের শেষাশেষি। একে ত বর্ষাকাল হইলেই গ্রামে জল ঢুকে। তাহাতে আবার খবর পাওয়া গেল দামোদরে ভীষণ বন্যা। দেখিতে দেখিতে অজয়েও তাহার প্রতিধ্বনির মত কল কল রবে বানদেবতার স্বাগত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। দুই তিন দিনের মধ্যেই বরাবর যতদূর জল আসে তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া স্ফীতোচ্ছল ফেণায়িত জলরাশি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ছড়াইয়া গড়াইয়া পড়িল।

সুরেন্দ্র নকিপুরে নিজ কন্যার জন্য একটি পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু এই অকস্মাৎ বন্যার জন্য সেখানে তিনদিন হইতে আটকাইয়া পড়িয়াছে। খেয়ার মাঝিরা

কোনও মতে সে তুফানে পাড়ি জমাইতে সাহসী নয়। শ্রাবণ ধারার মত বৃষ্টি ও তুফান যখন তিন দিনেও থামিল না—তখন সুরেন্দ্রকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সে জমিদারের শরণাপন্ন হইল, তাঁহার আদেশে মাঝি একবার মাত্র খেয়া বাহিতে অগত্যা স্বীকৃত হইল।

* * * * *

বেলা প্রায় বারটা। সুরেন্দ্র সারা পথ জল ভাঙ্গিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। কোথাও মাটি নাই—গাছ পালা, লতা, বাড়ী সব যেন জলে ভাসিতেছে। কত কত ঘর পড়িয়া গিয়াছে—সেই চালের উপর হতভাগ্য নরনারীগণ নির্ব্বাসিতের মত কাঁদিতেছে। গ্রামের গবাদি পশু কতক ভাসিয়া গিয়াছে, কতক মরিয়া গিয়াছে—অবশিষ্ট গুলিও এই সমাগত বিপদে মুহ্যমান্ হইয়া মরিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছে। এই নিরন্ন, আশ্রয়চ্যুত, শীতজর্জ্জর, বর্ষাধারায় অনাচ্ছাদিত অনাবৃত পল্লীবাসীদিগের ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি দেখিয়া সুরেন্দ্র বড়ই ব্যথিত হইল। তাহার নিজের পরিবারের কথা মনে পড়িল। পড়িতেই তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল। তাহার প্রধান ভাবনা—এবার গৃহহীন হইলে কে আশ্রয় দিবে? ক্রমশ সুরেন্দ্র আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে এতই বিমনা হইয়া পড়িল যে, তাহার মাথায় নিজের কথা ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তারই স্থান রহিল না।

সুরেন্দ্র উত্তরপাড়ায় যখন পৌঁছিল, তখন দেখিল যে কেবল এই দিকেই জল আক্রমণ করিতে পারে নাই। দেখিয়াই তাহার ভয়পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে একটা আশার জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিল।

সুরেন্দ্র গৃহে পৌঁছিয়া প্রথমে স্ত্রীকন্যাগণকে দেখিয়া তাহার সমস্ত দুর্ভাবনার বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইল। জলে ভিজিয়া ও পথ হাঁটিয়া সে যে ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। তখন আবার মনে হইল যে গ্রামের কি দুর্দ্দশা সে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে। সকল দশা তাহার ভাল মনে না থাকিলেও, কুস্‌মি বাগ্দীকে ঘরের চালার উপর তিনদিনের প্রসূত সন্তান কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছে—তাই তাহার জন্য গৃহে একটু স্থান করিয়াই সে আবার তখনই বাহির হইয়া গেল।

কুস্‌মি বাগ্দীকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া, সুরেন্দ্র তাহার বাপের ভিটার অবস্থা দেখিতে ছুটিল। সে পথে গিয়া দেখে যে সেখানে হাঁটু ভোর জল, ঘরখানি ডুবু-ডুবু। কিয়ৎক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া সে ভাবিল যে বাড়ীখানির তো পড়িতে বেশী দেরী নাই। কাযেই বাড়ীর লোকেরা কোথায় এই দুর্য্যোগে গিয়া দাঁড়াইবে, এ চিন্তা করিয়া সুরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না। কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে কোমর-ভোর জলে নামিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

নিকটেই একটি অশ্বথতলে হরেন্দ্র, ক্ষান্তমণি, সতীশ, তাহার পত্নী, হরেন্দ্রের স্ত্রী ও তাহার চারিটি কন্যা গৃহহীন হইয়া কাঁদিতেছে। সুরেন্দ্র তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই।

সুরেন্দ্রকে বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া হরেন্দ্র ডাকিল —"দাদা—ও দাদা— ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?"

সুরেন্দ্র চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখ ফিরাইতেই গৃহহারা আত্মীয়গণকে দেখিতে পাইল। সুরেন্দ্র ফিরিল। নিকটে আসিলে, হরেন্দ্র তীব্র অথচ সলজ্জ দৃষ্টিতে—পরুষ অথচ করুণ, উদ্ধত অথচ আত্মসমর্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলে ?"

সুরেন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একহাতে এক পোঁটলা ও অন্য হাতে একটা বাক্‌স মাথায় তুলিতে তুলিতে কহিল—"চল' চল' আগে বাড়ী চলত ? মারা যাবে যে ? কতক্ষণ এমন করে' দাড়িয়ে আছ তোমরা ? হেঁঃ—সব একেবারে ছেলেমানুষ ! এস, এস।" বলিয়াই সুরেন্দ্র চলিতে লাগিল।

সাপুড়িয়ার মন্ত্রে মুগ্ধ সর্পের মত সকলেই সুরেন্দ্রের অনুসরণ করিল।

হরেন্দ্র মনে মনে অনেকগুলি কথা সাজাইয়া ডাকিল— "দাদা—" ; কথা আটকাইয়া গেল। চক্ষু দিয়া সজোরে

অশ্রুপ্রবাহ বহিতে আরম্ভ করিল। হরেন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও সে বেগ রোধ করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্র উত্তর দিল—"ভাই!"

আর কোনও কথাই হইল না।

ভিক্ষুক

পশ্চিমের বহুজনাকীর্ণ ধূলিমলিন শহর। সদর রাস্তার সমস্তটা গাড়ী-জুড়ি ধনী-মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া একটি পাশে একটা বৃদ্ধ তেঁতুল গাছের তলায় অন্ধ হোসেনি প্রত্যহ ভিক্ষায় বসিত। সে এইখানটিতে আজ অনেক দিন হইতে বসিতেছে। গায়ে একটা শতছিদ্র চাপ্‌কান্‌, মাথায় একটা অত্যন্ত ময়লা পাগ্‌ড়ী, পরণে একটা ছেঁড়া পায়জামা। কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত—সব সময়েই হোসেনি এইখানটিতে দৈন্যম্লান কুণ্ঠাভরা অটল মৌনতায় বসিয়া থাকিত। পাগ্‌ড়ীর দুল্যমান্‌ অংশটি দিয়া প্রখর রৌদ্রে যেমন সে কপালের ঘাম মুছিত, দারুণ শীতেও তেম্‌নি এই টুকু দিয়াই সে কাণ ঢাকিয়া শীতের আক্রমণকে ব্যর্থ করিত।

তার চাপ্‌কানের সম্মুখ দিকের ঝুলটা দুই হাতে পাতিয়া হোসেনি চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিত। যাহার যাহা খুসী হইত, সে সেই আঁচলে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইত। তার দক্ষিণে বামে, দূরে অদূরে আরও অনেক দরিদ্র নরনারীরা আসিয়া বসিত; সন্ধ্যা হইলে—লোক-চলাচল কমিয়া আসিলে—তাহারা উঠিয়া যাইত। হোসেনি বসিয়াই থাকিত। অদূরে কাছারীর পেটা ঘড়িতে ছয়টা বাজিলে

সে সান্ধ্য নমাজ পড়িয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বৃক্ষমূলে সরিয়া যাইত; রাত্রে একটা উঁচু শিকড়ে মাথা রাখিয়া সেই তরু তলেই ঘুমাইত।

হোসেনি মুখ ফুটিয়া কিছু কহিত না। তার আশে পাশে সকলে চীৎকার করিত, পথিককে সেলাম করিত, দুঃখ-ব্যথা জানাইত, পেট চাপড়াইত, খঞ্জ পদ, বিকৃত হস্ত দেখাইত, কত কি করিত—কিছু না পাইলে গালি দিত, পাইলে একটু আশীর্ব্বাদ করিত; কিন্তু হোসেনি দাতাকেও আশীর্ব্বাদ করিত না, অ-দাতাকেও কটুবাক্য বলিত না। তবে কখন কখনও সে আপনার মনে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিত—"দিয়া—লিয়া—বখ্‌ত পর্‌ কাম আবেগা!" কিম্বা যদি কখনও দাতাকে কিছু বলিত, তো বলিত—"খোদা তেরা দম্‌কো আবাদ রাখ্‌খে!"

এই রাস্তাতেই দিনের মধ্যে বেশী লোক চলে—কারণ এই দিকে আদালত। এই জন্য ভিক্ষুকও এ পথে অপেক্ষাকৃত বেশী। যারা বসিত সকলেই কিছু না কিছু পাইত, কিন্তু হোসেনির নীরব দৈন্য খুব কম লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

স্কুলের ও পথের ছেলেরা কত সময় তার আঁচলে ইট মাটি ধূলা ফেলিয়া দিয়া আমোদ করিয়াছে, বিস্কুট বলিয়া ঘুঁটে দিয়াছে,—হোসেনি যেমন হাতে করিয়া টিপিত অমনি ছেলেরা এক সঙ্গে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া

উঠিত। হোসেনি সেগুলি ফেলিয়া দিয়া, আঁচলটি সাফ্ করিয়া পূর্ব্বের মতই বসিত—বিরক্ত হইত না। কত দিন তাহার আঁচল হইতে পয়সা উঠাইয়া লইয়া কত দুষ্ট ছেলে পলাইয়াছে—হোসেনি যেন জানিয়াও জানে নাই, এমনি ভাব করিয়া বসিয়া থাকিত। কেহ বলিয়া দিলেও হোসেনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত বা ক্রুদ্ধ হইত না।

সম্মুখেই, অর্থাৎ পথের ওপর ফুটপাথে, হায়দারের রুটির দোকান্। হায়দার প্রত্যহ হোসেনিকে এক খানি করিয়া রুটি দিত—হায়দারের ভৃত্য একটা এনামেলের গ্লাসে করিয়া খানিকটা জল দিয়া যাইত। সে তাই খাইয়াই জীবনরক্ষা করিত। কখন কখনও হোসেনি তাহার সঙ্গীদিগকে বলিত—"আর কত দিন? পঞ্চাশ বছর তো পার হ'লো—আর কত দিন?" হোসেনি জানিত যে হায়দার তাহার আহার যোগায় কিন্তু সে একদিনও মুখের কথায় তাহার কৃতজ্ঞতা জানায় নাই।

ভিক্ষুকেরা মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করে। কিছু দিন অন্তর এ পথের লোক অন্য পথে যায়, অন্য পথের লোকেরা আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে। কত দল গেল, কত দল আসিল। কত কত কণ্ঠের কাকুতি-মিনতি, হুঙ্কার-চিৎকার কত কত পথিকের কর্ণ ভারাতুর করিল—হোসেনি কিন্তু এই একই জায়গায় একই রকমে কাটাইয়া

দিতেছিল। কখন কখন এক আধজন লোক বলাবলি করিতে করিতে চলিয়া যাইত—"এ লোকটা বরাবর এই খানেই বসে, কখনও কিন্তু একটু নড়চড় দেখ্‌লাম না বা গলার একটা আওয়াজও শুন্‌লাম না!"

হায়দার বলে, "বছর খানেক আগে একে আমি কখনও দেখি নাই।" রহিম দপ্তরিও হোসেনির খুব তারিফ্‌ করে। রহিমের বাড়ী হায়দারের বাড়ীর লাগালাগি।

* * * * *

পৌষ মাস। প্রচণ্ড শীত। খবরের কাগজে প্রকাশ, এবারকার শীতের মত শীত বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আর হয় নাই। বিলাতেও নাকি তাই এবার খুব 'সুখের খ্রীষ্টমাস্‌' হইয়াছে।

সকাল হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। বাতাসও যেন দীর্ঘ বিরহের অবসানে বৃষ্টিধারার সহিত মিলিত হইয়া ঘন ঘন নিবিড় আলিঙ্গনপাশে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। হোসেনি তাহার বক্র দেহ-যষ্টিখানিকে আজ তেঁতুলতলের অতিনিকটে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। চিরদিনের বিস্তৃত আঁচলখানি আজ তার জানু দুটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। পাগ্‌ড়ী চাপ্‌কান্‌ এবং পায়জামা সবই জলে ভিজিয়া গিয়াছে। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বৃক্ষকাণ্ডের পানে আরও সরিয়া বসিল।

তখন সন্ধ্যা ছয়টা। এরই মধ্যে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইতে লাগিল। অন্ধকার আপনার বিরাট সত্তায় চারিদিক ছাইয়া ফেলিল। পথে লোক নাই, গাড়ী নাই, আলো নাই। কেবল অন্ধকার! পর্দ্দায় পর্দ্দায় স্তরে স্তরে মাটি হইতে আকাশ পর্য্যন্ত অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। পথিপার্শ্বে তিন্তিড়ীতলে অন্ধ হোসেনি এবং তাহার পাশে একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্তা গৃহহারা ভিখারিণী।

ভিখারিণীটি আজ কয়েক দিন হইতে এই খানে বসিতেছে। শীতে ও বৃষ্টিতে সেও গাছের গোড়া ঘেঁসিয়া আসিয়াছে। রাস্তার কুকুরগুলি লোকের বারান্দায় উঠিয়া শয়ন করিয়াছে। বাদলে বাতাসে কেবল মাতালের মত হা হা করিয়া হাসিয়া হাসিয়া ছুটাছুটি মারামারি করিতেছে!

ক্রমশ ক্লান্ত নিদ্রাতুর পবন থামিয়া গেল—টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় ফোঁটায় রুদ্ধ বৃষ্টি বর্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। বৃক্ষপত্রে বৃষ্টিধারা এবং বৃক্ষনীড়ে সুপ্ত পাখীর আর্দ্রপক্ষধূননরবে মৃত্যু-রজনীর তমিস্র যবনিকাখানি মুহুর্মুহু আন্দোলিত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। রাজপথে গৃহগবাক্ষ দিয়া বিকীরিত আলোক-জ্যোতিও জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। যে আলোকরশ্মি এতক্ষণ জনহীন বহির্জগতকে এক সূক্ষ্ম সূত্রে গৃহস্থের সঙ্গে যুক্ত রাখিয়াছিল —সে যোজকসূত্রটিও ছিঁড়িয়া গেল। ইট-পাথরের শক্ত

দেওয়ালগুলাও সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন ভীষণতর দৈত্যের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

হোসেনি সমুজ্জ্বল দিবালোকেও যেমন দেখিত, এখনও তেমনি দেখিল। কেবল শীতে তাহাকে অত্যন্ত কাবু করিয়া ফেলিল। সে বুকের উপর হাঁটু দু'টি আঁকড়াইয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভিজিতেছিল। বৃক্ষকাণ্ডের অপর পার্শ্বস্থিত ভিক্ষুক-রমণী যখন দেখিল যে তাহার নয়ন-পথের শেষ বাতিটিও নিবিয়া গেল, তখন সে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হতভাগিনী এখনও কামনা করিতেছিল—হয় ত কোনও হৃদয়বানের নীরব চরণপাতে সাহায্যসান্ত্বনায় পুলকিত হইয়া উঠিবে, হয়ত কোনও দাতা গোপন-দানের জন্য আসিয়া তাহাকে একটু খাদ্য আর এক টুকরা গরম কাপড় ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে —তাই সে বিলম্বে ছট্‌ফট্ করিতেছিল; অসহ যন্ত্রণাকে ধৈর্য্যের হাত ধরাইয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু বিশ্বজগতের সহিত সকল সম্বন্ধের একটি সকরুণ অবশেষের মত এই দীপরশ্মিটিও যখন অন্তর্হিত হইল —তখনই ভিখারিণীর নৈরাশ্যখানি খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া, সূচীভেদ্য অন্ধকারে একটা দম্‌কা হাওয়ার মত তাহার বক্ষপঞ্জরগুলিকে সজোরে আঘাত-আলোড়িত করিয়া দিল। সে গভীর আর্ত্তনাদে, অস্ফুটস্বরে বলিল—"ওঃ—";

আবার কহিল—"বাবা—"। হোসেনি শুনিল, কিন্তু কোন কথাই বলিল না।

রমণী ডাকিল—"মিয়া সাহেব!—"

হোসেনি উত্তর দিল—"কি মা?"

শীতে এবং ক্ষুধায় রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কুষ্ঠরোগিণী ভিখারিণী থামিয়া থামিয়া, দমিয়া দমিয়া বলিল—"বাবা, আরতো আমি বাঁচি না। আমাকে বাঁচাও।" রমণী বসিয়া থাকিতে থাকিতে ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল।

হোসেনি ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল,—"ভয় কি মা? এই যে, আমি এই খানেই আছি।" রমণী কোনও উত্তর করিল না। হোসেনি উত্তর প্রতীক্ষায় কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল—কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাইল না। বসিয়া বসিয়াই আস্তে আস্তে হোসেনি রমণীর নিকট সরিয়া আসিল; হাত্ড়াইয়া হাত্ড়াইয়া হোসেনি দেখিল সে কাদার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে।

হোসেনি ডাকিল—"ওগো—মা—ওগো, এখানে কি শোয়?—এ যে কাদা?" আবার বলিল; আবার বলিল—সাড়া নাই! অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিল—"ওগো, এমন জলের উপর শুলে কেন?"—নিরুত্তর। নাড়া চাড়া দিয়া ডাকিল—"ওগো, কথা কইচ না কেন? বলি—" রমণী এতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিল, সহসা সংজ্ঞালাভ করিয়াই ক্ষীণতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমি আজ তিন দিন কিছু খাই

নাই, বাবা ; কেউ আমাকে একবারটি জিজ্ঞাসাও করে নাই ! আর আমি থাক্‌তে যে পার্‌ছি না !" রমণী কাঁদিতে লাগিল।

সেদিন হোসেনির হায়দারের দেওয়া রুটির একটু খানি ছিল ; সে পাগ্‌ড়ির একটা খুঁটে সেটুকু বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—তার মনে পড়িল। দৃষ্টিহীন হোসেনি রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া শীত-জর্জ্জরিত ভূলুণ্ঠিত ভিখারিণীর মুখে একটু একটু করিয়া তুলিয়া দিল। রুটিটুকু আগে হইতেই জলে ভিজিয়া নরম হইয়াছিল বলিয়া, তাহার খাইতেও কোন কষ্ট হইল না। কাপড় নিংড়াইয়া তাহার মুখে জল দিয়া হোসেনি যখন এই হতভাগিনীকে মৃত্যুর মুখ হইতে ছিনাইয়া লইল, তখন তাহার আবার এক নূতন উপসর্গ জুটিল। শীতের কাঁপুনি এবং যন্ত্রণা নারীকে দ্বিগুণ জোরে চাপিয়া ধরিল। ক্ষুন্নুমূর্ষু বলিয়া এতক্ষণ যাহারা উদাসীন ছিল—এখন তাহারা আত্মপ্রকাশ করিল, কারণ ক্ষুধা হারিয়া গিয়াছে।

ভিখারিণী বলিল—"মিয়া সাহেব, তুমি আমার বাপ। আজ আমার জান্‌ বাঁচালে।"

শীতে রোগ-দুর্ব্বল দেহের ক্ষীণ রক্তস্রোতটিকে প্রায় বন্ধ করিয়া আনিতেছিল!—কথাও রুদ্ধপ্রায় হইয়া কষ্টোচ্চারিত। তবুও বুকে হাঁটু দুইটি চাপিয়া রমণী উঠিয়া বসিল। হোসেনি বুঝিল, আপনার জায়গাটিতে সরিয়া বসিল।

আকাশে একটা বিদ্যুৎ হানিল। বৃষ্টিধারাগুলি একবার চকিতে পুষ্পবৃষ্টির মত ফুটিয়া উঠিয়া আবার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। ঘনগম্ভীর মেঘস্বননে জমাটবাঁধা অন্ধকারে উপর হইতে একটা চাপ পড়িল। তীরের মত একটা বাতাসও সেই সময়ে রাস্তার এপার হইতে আসিয়া নর্দ্দামা ডিঙ্গাইয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে ওপার দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রমণী শীতকম্পিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল—"বাবা, শীতে ম'লুম! আর বাঁচি না!" হোসেনি নীরবে মাথার পাগড়ীটি তাহার আবরণের জন্য দিল। স্ত্রীলোকটি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা অঙ্গুলি ছিল না—তাহার গায়ে জড়াইয়া দিতে বলিল, হোসেনি নীরবে পালন করিল। তবু ও তার কাঁপুনি থামে না! তাহার উপর ক্ষতস্থানসমূহ দিয়া রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়াছে!

রমণী "বাপ্‌রে, মারে" করিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। হোসেনি পাগ্‌ড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে চাপ্‌কান পায়জামাটি পর্য্যন্ত দিয়া ভিখারিণীকে আবৃত করিয়া দিল—কিন্তু তবুও তাহার না থামে কম্পন, না থামে যন্ত্রণা! আর সে কি করিবে? স্থানও নাই, ছাতাও নাই। জলপড়া আট্‌কায় কিসে? বহু পূর্ব্বেই তো হোসেনি তার নিজের জায়গাটি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। এবার নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া সামান্য

একটু কৌপীন্ মাত্র পরিয়া, হোসেনি মুক্ত আকাশের তলে আপনাকে ছাড়িয়া দিল!—হোসেনির শুশ্রূষায় স্ত্রীলোকটি ক্রমশ একটু একটু সুস্থ হইতে লাগিল বটে, হোসেনি কিন্তু জলে ভিজিতে লাগিল। জল বাতাস ও শীতের সহিত সে নগ্নদেহে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

* * * * * *

প্রভাতে আকাশ নির্ম্মেঘ! প্রাতঃসূর্য্য কিরণমালায় জলঝরা তৃণপত্রে মুক্তামালা দোলাইয়া দিয়া দিগন্তব্যাপিনী এক অপূর্ব্ব শান্তশ্রী ছড়াইয়া দিয়াছে। পথপার্শ্বের পয়ঃ-প্রণালীতে কল-কল ছল-ছল করিয়া কর্দ্দমাক্ত জলরাশি ছুটিয়া চলিয়াছে! পথে এখনও স্থানে স্থানে জল জমিয়া সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। অদূরে দুই একটি কুকুর সদ্যোনিদ্রোত্থিত হইয়া রাস্তায় যেখানে রৌদ্র পড়িয়াছে, সেই খানে সম্মুখ ও পশ্চাতের পায়ের জোড়া দুইটিকে কিঞ্চিদধিক ফাঁক করিয়া কটি অবনমিত করিয়া হাঁই তুলিতেছে। একটি দুইটি করিয়া দোকান পাট সব খুলিতে লাগিল। গতরাত্রের সেই পথে আবার সুখ-দুঃখের ব্যস্ত কোলাহল জাগিয়া উঠিল।

হায়দার দোকান খুলিল। প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী একখানি রুটি লইয়া তেঁতুলতলায় আসিয়া দেখে, প্রতিদিনের মত হোসেনি তাহার নিজের জায়গাটিতে আজ আর বসিয়া নাই। বরং তাহার খানিকটা দূরে, ফাঁকা

আকাশের নীচে একটু কৌপীন পরিয়া কাদার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। হোসেনির স্থানটিতে তাহারই কাপড় চোপড়ে আবৃত একটি কুষ্ঠরোগিণী ভিখারিণী পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার বিকৃত মুখমণ্ডলে সূর্য্যালোক পড়িয়া মুখখানিকে আরও বিকৃত অথচ করুণ দেখাইতেছিল।

হায়দার মুসল্‌মানী কায়দায় সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া হোসেনিকে ডাকিল। হোসেনি নিরুত্তর—গাঢ় সুপ্ত! হায়দার তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া দেখিল—সে দেহ বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, পাথরের চেয়েও শক্ত!!

গৌরী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৌরীর কপাল পুড়িল।

সতীশের মা সতীশকে ধরিয়া বসিলেন—বাবা, তুই তবে আর একটা বিয়ে কর্, সতু। বৌমার আর ছেলে টেলে কিছু হবে না, ও বাঁজাই হলো।

পুত্রকে নীরব দেখিয়া, মা ভাবিলেন পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহে ইচ্ছা নাই; তাই অনুরোধটাকে একটু জোরালো করিবার জন্য অঞ্চলাগ্রে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে ভগ্নস্বরে কহিলেন—এমন কপালও করেছিলাম যে এই পঞ্চাশ বছর বয়স হতে গেল, কোনও সুখ হলো না! অদেষ্টে মারি ঝাড়ির ঝাঁটা! অমন তিন তিনটে সোনারচাঁদ ছেলে যমের পেটে দিলাম যে! তা নৈলে আর আমার ভাবনা কিসের?—

এ প্রস্তাবে সতীশ পুলকিত হইল কি দুঃখিত হইল, তাহা সে নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না। তাহার মাথার মধ্যে কথাগুলি সব বোঁ বোঁ করিয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মা কিছুক্ষণ থামিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন—কপালগুণে গোপাল মেলে! তা নৈলে গাঁয়ে ত' এত লোকই রয়েচে—কার আর এমন ছেলের বৌ বাঁজা?

সতীশ কহিল—আচ্ছা, মা, এ বিষয়ে ভেবে দেখ্‌ব! এখন বড় তাড়াতাড়ি, একবার বেরুচ্ছি; দাঁড়াতে পার্‌ব না। বলিয়া সতীশ চালের বাতা হইতে চটি জোড়াটি পাড়িয়া, দুই হাতে দুই পাটির তলায় তলায় বার দুই সজোরে ঠুকিয়া ধূলা ঝাড়িয়া, ঠেলিয়া পায়ে পরিয়া, পট্‌ পট্‌ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মা অস্ফুট স্বরে বলিলেন—ঠিক যা ভেবেচি।

গৌরী সন্ধ্যা দিতে শাশুড়ীর ঘরে ঢুকিয়াছিল। মাটির প্রদীপটি হাতে করিয়া সে সব শুনিল। হঠাৎ অতর্কিত দীর্ঘ নিশ্বাসের দম্‌কা হাওয়ায় করধৃত দীপটি নিভিয়া গেল! সম্মুখদিকের চালে একটা টিক্‌টিকি "টক্‌ টক্‌ টক্‌ টক্‌" করিয়া ডাকিয়া উঠিল। গৌরী সে অবসন্ন অবস্থাতেও অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা ভূমিতে তিনটি টোকা মারিয়া, তর্জ্জনীটি কপালে ঠেকাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিগত কয়েক মাস হইতেই সতীশের মা এইরূপ একটা কল্পনা করিতেছিলেন। প্রথম প্রথম বধূর অপ্রত্যক্ষ্যেই গ্রামের বর্ষীয়সীদের সঙ্গে পরামর্শ চলিত; পরে গৌরী যখন সব শুনিয়াই ফেলিল—তখন হইতে আর এ আড়াল আব্‌ডাল রহিল না।

গৌরী নীরবে শুনিত—শুনিতে শুনিতে তাহার

হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া পড়িত, কিন্তু কি করিবে? উপায় নাই। তাহাকে এমন বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইবে যাহার উপর মানুষের কোনও ক্ষমতা চলে না—অথচ সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে, তাহার জীবনের সমস্ত সুখ একেবারে বিধ্বস্ত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পুত্রবতী হইতে গৌরী কত ব্রত করিল, ঠাকুরঘরে, ষষ্ঠীতলায় কত প্রার্থনা জানাইল, তেত্রিশকোটি দেবদেবীর কাছে কায়মনোবাক্যে কত মানৎ করিল, সাধু সন্ন্যাসীকে হাত দেখাইল, মাতুলী কবচ ও দেবতার পুষ্প ঝুলাইয়া কণ্ঠে বাহুতে এবং কটিতে অলঙ্কারের পর্য্যন্ত স্থানাভাব ঘটাইল, কিন্তু সব বিফল হইল। তাহার দূর সম্পর্কীয়া এক পিতৃস্বসা জগন্নাথ-দর্শনে পুরী গিয়াছিলেন; তিনিও গৌরীর জন্য অক্ষয়বটতলে আঁচল পাতিয়াছিলেন কিন্তু তাঁর আস্তৃতঅঞ্চলে কোন ফল পড়ে নাই শুনিয়া সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে গৌরী বন্ধ্যাই। কেবল গৌরীই একা সম্পূর্ণরূপে ভরসা ছাড়ে নাই, যে যদি অসম্ভব সম্ভব হয়। সে কি করিয়া নিরাশ হয়? শুধু তো তাহার এ দুর্ভাগ্য একা আসিবে না—এর সঙ্গে সঙ্গে যে তার সব-চেয়ে-বড় সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই সে এত দিন কোন রকমে আপনার মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ সে তাহার সর্ব্বনাশকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিল। বন্ধ্যাত্বের সহিত তাহার স্বামীর উপর অধিকারটুকু পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইতে বসিয়াছে। গৌরীর বুক ভাঙ্গিয়া

গেল। একটা বিরাট দৈত্য অদৃশ্যে তাহার বক্ষোমঞ্চের উপর তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল। দিন দিন তাহার সদাপ্রসন্ন হাস্যপুলকিত শ্যামোজ্জ্বল মুখশ্রী ম্লান হইতে লাগিল।

গৌরীর দেহবর্ণ শ্যাম বলিয়া সতীশ তাহাকে ইদানীং অপছন্দ করিত; নিরক্ষর বলিয়া যখন তখন অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের বিদুষী স্ত্রীদের সঙ্গে তুলনা করিয়া অন্ত্যজ জাতীয়া রমণীদের সহিত একাসন দিত; এবং স্বামীর সহিত প্রেমালাপের রীতি-পদ্ধতি জানে না বলিয়া কটুকাটব্য পর্য্যন্ত করিত—কিন্তু গৌরী তাহাতে একদিনের জন্যও দুঃখিত বা অপমানিত বিবেচনা করে নাই, বরং আপনার হীনতায় এবং পরম দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না বলিয়া নিজেই সতত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত।

ঐরূপ অপদার্থ একটা স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে পাইয়া সতীশ সর্ব্বদাই আপনাকে হতভাগ্য ভাবিত,—এবং তাহার জীবনের যে সব সুখ সেই কুরূপা গৌরীই নষ্ট করিয়া দিয়াছে—এ কথা সতীশ খুব জোরের সহিতই গৌরীকে পুনঃ পুনঃ শুনাইয়া থাকে। গৌরী তাহা শুনিয়া নীরবে কাঁদিত আর গলায় কাপড় দিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিত—হে ঠাকুর, আমার এমন স্বামী! তোমার পায়ে ধরি, যাতে তাঁকে সুখী করতে পারি সে ক্ষমতা আমায় দাও! দেবতা সে কথা শুনিয়াছিলেন কি না জানি না কিন্তু নিয়তি তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিল।

স্বামী কি শাশুড়ী কাহারও কথার প্রতিবাদ সে কখনও করে নাই ; কারণ তাহার বিশ্বাস যে তাহাতে পাপ হয়। সতীশ কল্পিত দোষারোপ করিয়া অন্যায়ভাবে ভৎসনা করিয়াছে, গৌরী নীরবে শুনিয়াছে ; শেষে সজলনয়নে সে দোষের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়াছে। তবু কখনও বলে নাই—যে সে এ কায করে নাই। তাহার ধারণা তার কোন গুণ নাই, তবু যে তাহাকে তাহার স্বামী ত্যাগ করেন নাই—ইহাই তাহার যথেষ্ট লাভ ও সুকৃতি। আর নারীর শ্রেষ্ঠধর্ম্মই পতির আজ্ঞাধীনতা। তাই এতবড় একটা কথা শুনিয়াও গৌরী বাহিরে অনেকটা স্থির-ধীরই রহিল।

দীঘির ঘাটে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল—বাঁড়ুয্যে না কি আবার বিয়ে করবে, গৌরি ?

গৌরী সলজ্জভাবে উত্তর দিল—হাঁ, করবেন্।

কেন ?

আমার যে ছেলে হলো না ভাই !

গৌরীর চক্ষু ছলছল হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সতীশের বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। সতীশের পূর্ব্বে তাহার আরও তিনটি সহোদর জন্মিয়াছিল কিন্তু কেহই বেশীদিন বাঁচে নাই।

সতীশের মা এই পিতৃহীন একমাত্র জীবিত চতুর্থ পুত্রটিকে সমস্ত প্রাণ দিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়িয়া সতীশ যখন পাশ হইল—তখন সকলেই সতীশকে চক্‌দীঘির ইংরাজী বড় স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিতে তাহার মাকে অনুরোধ করিল। গ্রাম হইতে চক্‌দীঘি মাত্র সাত ক্রোশ। কিন্তু মাতৃস্নেহ সন্তানকে চক্ষের আড়ালে রাখিতে স্বীকৃত হইল না বলিয়া সতীশের বিদ্যা-লাভ গ্রামেই পরিসমাপ্ত হইল। বিশেষতঃ ইংরাজী শিখিলে দূরদেশে চাকরী করিতে যাইতে হয়, মাতাপিতা দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি থাকে না, হিন্দুধর্ম্ম-বহির্ভূত সর্ব্বপ্রকার অখাদ্য ভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মায় ইত্যাদি আশঙ্কা করিয়া জননী আর পুত্রকে ইংরাজী শিখিতে দিলেন না।

সতীশ গ্রামের একজন ভাল ছেলে। কাযেই জমিদারের সেরেস্তায় অনতিবিলম্বেই তাহার একটা কর্ম্ম হইল।

এই সময়ে বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় আসিয়া সতীশের মাকে ধরিয়া বসিলেন যে তাঁহার মত গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতেই হইবে, ইহাতে মহাপুণ্য, শত শত গো দানের ফল। মা দেখিলেন যে গাঁয়ে ঘরে যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই তো সব চেয়ে ভাল; ছেলেও চক্ষের আড়ালে যাইবে না, আর বউকেও ডাকিতে হাঁকিতে বিপদে আপদে সব সময়ই পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া তিনি

সকলের মুখেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাটির অজস্র প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। তবু একদিন গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিয়াই রাজী হইলেন।

গৌরীর রং নবোদিত কিশলয়ের মত শ্যাম—যাহা মাজিলে ঘসিলে পরিষ্কার হইতে পারে কিন্তু তাহা কথনই রক্ত শ্বেত বা পীতবর্ণে পরিণত হইয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিতে সমর্থ নয়। নাকটি বাঁশির মত, চোখ দুটি টানা টানা বড় বড়, সলজ্জশ্রীতে মনোরম; ভুরু দুইটি লম্বা মোটা ও জোড়া; হাতপা গুলিও থাট' থাট' গোলগাল—গা'টিও বেশ নরম; মাথায় একঝাড় চুলও আছে। খুব শান্ত শিষ্ট এবং ঘরকন্নার কায সবই শিখিয়াছে। মা একেবারে গলিয়া গেলেন। সপ্তদশবর্ষেই সতীশের গৌরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। গৌরীর বয়স দশ বৎসর। তথন সতীশের বহির্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা এত প্রথর হয় নাই। সে বিবাহ করিয়া আশাতীত রকমের এক গৌরব অনুভব করিল। অনাস্বাদিতপুলকে সতীশের মন-প্রাণ বিভোর হইয়া গেল।

গৌরী শ্বশুরালয়ে আসিয়াই, রান্নাঘরে শাশুড়ীর প্রবেশ নিষেধ ঘোষণা করিয়া দিল। সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই সে শয্যাত্যাগ করিয়া বাড়ীর পাট সারিয়া শাশুড়ীর ঘরের দুয়ারে গিয়া বসিয়া থাকিত। শাশুড়ী কত নিষেধ করিয়াছেন সে তাহা শুনে নাই।

শাশুড়ী বধূর শত শত প্রশংসাবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বধূরও তাহাতে কায করিবার, সেবা করিবার ইচ্ছাটি প্রবলতর এবং শক্তিও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শাশুড়ীর অপরিসীমস্নেহচুম্বন ও প্রশংসায় এবং স্বামীর প্রীতিতে গৌরীর নারীত্ব,—মাধুর্য্যে, বিনয়ে এবং কোমলতায় এক অপূর্ব্ব শ্রীতে দিন দিন বিকশিত হইতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে গৌরী কখনও লেখাপড়া কার্পেটবোনা বা উলতোলা শেখে নাই—দিবারাত্র মধ্যবিত্ত পল্লীগৃহস্থের কন্যা হইয়া সংসারের কাযকর্ম্মই শিখিয়াছে বলিয়া—শ্বশুরবাড়ীতেও সে অক্লান্তভাবে গৃহস্থালীর কায সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। মায়ের কাছে শিখিয়াছিল যে শ্বশুরবাড়ীতে লজ্জা-সরম করিয়া চলিতে হয়—আজ দশ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, তবুও শাশুড়ী বারম্বার খাইতে না বলিলে সে কখনও নিজের ভাত বাড়িয়া লয় না। এই সঙ্কোচ শাশুড়ীর নিকট এতদিন রমণীয় এবং প্রশংসনীয় বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছিল। তবু গৌরীর কপাল পুড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশের বিবাহের যখন সমস্ত পাকাপাকি আয়োজন চলিতে লাগিল, তখন একদিন গৌরীর পিতা আসিয়া সতীশের মাকে এ বিষয়ে আরও একটু বিবেচনা করিয়া

কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্তই হইলেন—আপনার জিদ্ ছাড়িলেন না। গৌরীর অজস্র প্রশংসা করিয়া বলিলেন—এমন ঘরণী গৃহিণী বৌ, এমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বউ ছেড়ে কি সাধে ছেলের বিয়ে দিচ্ছি, ভাই? একটা বংশ তো চাই?

বিষ্ণুপদ বলিলেন—এখন তো গৌরীর সে সময় উত্তীর্ণ হয় নাই? এর চেয়েও বেশী বয়সে যে লোকের সন্তান হয়।

সতীশের মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বেয়াই ক্ষেপেছ! এই অগ্রাণে যে বৌমা কুড়ি পেরোলেন? এর পর কি আর ছেলে হয়? আমার যখন প্রথম ছেলে কোলে হয়, তখন আমার বয়স চৌদ্দবছর মোটে।

বলিয়া তিনি বহুকালগত সেই সন্তানের জন্য কিছু আক্ষেপ করিলেন।

বিষ্ণুপদ বলিলেন—সে সব দিন আজকাল আর নেই, বেয়ান। আজকাল ২৫,৩০ বছরেও স্ত্রীলোকের সন্তান-সম্ভাবনা হয়।

সতীশের মা, ইহা মনভুলানো মিথ্যাকথা, যাহা কেবল হাস্যরস সঞ্চারের জন্য ব্যবহৃত হইল ভাবিয়া, উচ্চহাস্য করিয়া বৈবাহিকের রসিকতার প্রশংসা করিলেন।

গৌরীর মাও বেয়ানকে অনেক অনুনয় অনুযোগ করিলেন, কিন্তু বেয়ান আপনার কথা ছাড়িলেন না।

সতীশও ইদানীং গৌরীকে নূতন করিয়া অপছন্দ করিতে লাগিল। কারণ সে পঞ্জিকামধ্যস্থ বিজ্ঞাপনোক্ত প্রায় সমস্ত উপন্যাসগুলিই পড়িয়াছে, কিন্তু কোথাও গৌরীর মত বর্ণজ্ঞানবিহীন, অসভ্য কালো মেয়ে কোনও ভদ্র লোকের পত্নী আছে বা ছিল, তাহা পড়ে নাই। কাযেই সে এই সুযোগে একটি মনোমত পত্নী লাভ করিবার ফন্দীতে অতি সহজেই মত দিয়া, পাত্রী পছন্দ করার ভার নিজহস্তেই লইল।

সতীশের ইচ্ছা—তাহার ভাবীপত্নী, রূপে, বেশভূষায়, হস্তপদসঞ্চালনের অপরূপ ভঙ্গীতে, বিদ্যায়, শিল্পকলায়, কণ্ঠ-স্বরের মাধুর্য্যে, সীমন্তরচনার নূতনত্বে, হাবভাবের মৌলিকত্বে "বিদ্যুৎকুমার" উপন্যাসের শৈলবালার সমকক্ষ হইবে।

সম্প্রতি সতীশের উপর জমিদারবাবুদের মামলামোকদ্দমা তদ্বিরের ভার পড়ায়, তাহাকে প্রায়ই মাটীপোতা মহ-কুমায় যাইতে হইত। সেখানকার জমিদারের মোক্তার রাম-নৃসিংহ রায়ের অনূঢ়া ষোড়শবর্ষীয়া পঞ্চমা কন্যাকে সতীশের মনে লাগিল। "শৈলবালার" বর্ণনার সঙ্গে নাকি রায়-মহাশয়ের কন্যা আন্নাকালীর দৈহিক অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সেই স্থানেই সব ঠিক হইল। শুভদিনে শুভকার্য্য সুসম্পন্নও হইয়া গেল।

বিবাহের দেড়মাস পরেই নববসন্ত হইল। বধূ স্বামীর ঘরে আসিয়া কায়েমী হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন।

গ্রামের লোকে বলিল—আন্নার কেবল রংটা একটু কটা' বলিয়াই বিকাইয়াছে, নচেৎ তাহার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এতই কুরূপ এবং কুৎসিত যে এই কটা চামড়াখানির অভাবে তাহাকে চিরজীবন কুমারীই থাকিতে হইত।

এ সমস্ত মন্তব্য সতীশেরও কিছু কিছু কর্ণগোচর যে না হইয়াছিল, তাহা নহে—তবে সে সে-কথায় বিন্দুমাত্রও টলে নাই। বরং সতীশ যতদূর সম্ভব আন্নাকালীকে শৈলবালার মতই রাখিতে যত্নবান্ হইল।

আন্নাকালী স্বামীর ঈদৃশ স্ত্রীভক্তিতে প্রথম প্রথম একটু সঙ্কোচ অনুভব করিত, কিন্তু স্বামীর নিয়ত উপদেশে এবং পতিনির্ব্বাচিত সদ্‌গ্রন্থ পাঠে ক্রমশ তাহার সে সমস্ত "কিন্তু ভাব" অন্তর্হিত হইল। তবে সে যে সহুরে-মেয়ে, তাহার পিতা পয়সাওয়ালা মোক্তার—এ অভিমান তার বরাবরই ছিল। এ জন্য সে গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে নির্ব্বিচারে তাহার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে হীন এবং অসভ্য ঠাওরাইয়া, মনে মনে ঘৃণা করিত।

এরূপ ভাবান্তরের মোটামুটি কয়েকটি কারণও ছিল। ইহারা যে কখনও থিয়েটার দেখে নাই, ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে নাই, মেম্‌সাহেবে ঘোড়ায় চড়ে', মাঠে বল্ খেলে তাহাও দেখে নাই, হাওয়াগাড়ী চড়া দূরে থাক্ চক্ষে দেখিয়াও কখনও মানবজন্ম সার্থক করে নাই, ইহাই

তাহাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ। এই সুযোগে প্রথম প্রথম আন্না তাহাদের নিকট অনেক সম্ভব অসম্ভব অলৌকিক অসাধারণ বিষয়ের গল্প করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিতে লাগিল। কিন্তু কেহ কোন বিষয়ে সন্দিহান বা প্রতিকূলে প্রশ্ন করিলেই সে চটিয়া গিয়া তাহাকে অপমান করিত।

পল্লীগ্রামের তথাকথিত অসভ্য রমণী হইলেও বিদ্যা না থাকুক, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান তাহাদের যথেষ্টই ছিল—কাযেই তাহারা গল্পের সে মোহও আত্মসম্মান রক্ষার্থ ত্যাগ করিল। এক এক করিয়া প্রায় সকলেই আন্নার সঙ্গ ছাড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৌরী সতীন, সুতরাং তাহাকে তো আন্না প্রথম হইতেই দূরে রাখিয়াছিল। গৌরী আন্নাকে প্রশংসমান্ সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিত, আর ভাবিত সে কি সৌভাগ্য-বতী! আহা ওর মত যদি গৌরীর কপাল হইত।

গৌরীর ইচ্ছা খুবই যে আন্নার সঙ্গে কথা কয় আলাপ করে, তার কাছে দুদণ্ড বসে; কিন্তু যে বিদ্বান্, সহুরে, স্বামীর মনোমত—তার কাছ ঘেঁষিতেও সে সাহস করিল না। সে ভাত রাঁধে, পাট করে, সকলকে খাওয়ায়, শাশুড়ীর সেবা করে আর গৃহবিতাড়িত ক্ষুধিত কুক্কুরের মত সতীশের পানে দীন-নয়নে এক একবার চায়।

আন্না একাই বা কি করিয়া কর্ম্মহীন জীবন সারাদিন ধরিয়া বহন করে? যাহার করিবার কায অনেক, অথচ তাহাতে যদি অবহেলা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অকায করিবার প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। স্বামীর অত্যধিক আদর পাইয়া তাহার আদর করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত,—সে কেবল খোঁচা মারিতেই শিখিল। সে বুঝিয়াছিল তাহার কায ন্যায় হউক অন্যায় হউক কেহই তাহাতে বাধা দিবে না। সুতরাং ক্রমশ তাহার ন্যায়ান্যায় জ্ঞান যেমন তিরোহিত হইল, তেমনি যথেচ্ছাচারের মাত্রাটিও বাড়িয়া চলিল।

নিজে সে কোন কাযই করিত না, অথচ গৌরী সাধ্যমত প্রাণপণ চেষ্টায় দাসীর মত তাহার আজ্ঞাপালন করে—কিন্তু সে ঐকান্তিক সেবাতেও আন্না ত্রুটি ধরিয়া গৌরীকে ভৎর্সনা করিত। শাশুড়ীর কৃত কোন কার্য্যই তাহার মনোমত হয় না—তজ্জন্য তিনি পুত্রবধূর নিকট অল্প বিস্তর শুনিয়া, অবশেষে পুত্রের মারফৎও শুনিতে লাগিলেন।

আন্না ভাবিয়াছিল, এইরূপ করিলে তাহার নাগরিকতা, সভ্যতা এবং বড়মানুষী যেমন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আদরের মাত্রাও তেমনি বাড়িতে থাকিবে।

বিবাহের পর প্রায় দুইবৎসর গেল, অথচ একবেলার জন্যও গৌরী যে পিত্রালয় যায় না—যাহার গ্রামে পিত্রালয়

—আন্না তারই কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কেবল তাহাই নহে, সে যে এই সারাদিন একটা সামান্য দাসীর মত পাট করে, পাচিকার মত দুইবেলা পাক করে আর আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত যাহা বলা যায় তাহাই প্রতিপালন করে—তাহারই বা কারণ কি? সে যে নিতান্ত নাতোয়ান্—অন্নাভাবে এই দাসীপণা এবং স্থানাভাবে এখানে অবস্থান করিতেছে—তাহাও তো বোধ হয় না। তবু যে কোনও রমণী সপত্নীর এরূপ আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে—ইহার এক নিগূঢ় কারণ আছে। আন্না ঠিক্ করিল যে, সে তো এ অবস্থায় একবেলাও থাকিতে পারিত না বা কখনও পারে না। কাযেই আন্না কারণ নিরূপণে ব্যস্ত হইল।

কয়েক দিন পরে ঠিক্ করিল—যে সতীশ এখনও তাহাকে ভালবাসে। আন্নার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। হিংসায়, দ্বেষে তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল! আন্না শুইয়া পড়িল। রাত্রে অশ্রুগম্ভীর বদনে আন্না কহিল—আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

সতীশ যেন স্বর্গচ্যুত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

আন্না মান-সংহত স্বরে কহিল—কেন কিসের? আমি বাড়ী যাই—তুমি ওকে নিয়েই থাক।

সতীশ বিস্মিত হইয়া সুধাইল—কা'কে? কা'কে নিয়ে থাক্‌বো?

—তোমার বউকে নিয়ে। ওকে যদি ছাড়্তেই না পার্‌বে, তবে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন?

—কি যে বল্‌চ' তুমি, আমি তার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না!

—বলি, বিকেল বেলা রান্নাঘরের ছাঁচ্‌তলায় ওর সঙ্গে কি ফুস্‌ফুস্‌ কর্‌ছিলে? মনে কর' আমি কিছু দেখ্‌তে পাই না, নয়? আমিও কিনা একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত যে কিছু বুঝি না?

সতীশ আশ্বস্ত হইয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বলিল—এই কথা?

—হাঁ, এই কথা!—বলিয়া আন্না সতীশকে ভেঙ্‌চাইল।

সতীশ একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—সোজাসুজি কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌লেই তো আমি বল্‌তাম। তুমি সে দিন হাঁসের ডিম ভাজা খেতে চেয়েছিলে, তাই ওকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম যে ও রান্না কর্‌বে কি না? এখানে আমাদিগকে ও সব লুকিয়ে খেতে হয় কিনা? নৈলে সমাজে জাতিপাত করে। এতো আর সহর দেশ নয়।

বলিয়া সতীশ আবার হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ করিয়া একটু হাসিল।

আন্নাকালী জিজ্ঞাসা করিল—ও কি বল্‌লে, রাঁধ্‌বে?

—হাঁ, তা' রাঁধ্‌বে।

—আচ্ছা, ও ওর বাপের বাড়ীই যাক্‌ না! তুমি বল

কেবল—ও গেলে কাযকৰ্ম্ম কে কর্‌বে? তা না হয় আমি আর মা দুজনে মিলে কায করব। না পারি শেষ পর্য্যন্ত একটা ঝি রেখে দিলেই চল্‌বে। আমি তোমায় বলি শোন’—আমি স্পষ্টকথা বলি। আমরা দুই সতীন। ও-ও আমায় দেখ্‌তে পারে না—আমারও যে ওকে খুব ভাল লাগে তা নয়। পরে কোন্ দিন ঝগড়াঝাঁটি হবে—তখন তুমি আমায় দুষ্‌বে। ওর হয়ে না হয় ওর বাপ মা আস্‌বে—আমার তো এথানে বাপ মা নেই? কায কি, পাঁচজন লোক হাসিয়ে?

সতীশ আন্নাকালীর বিচক্ষণতায় চমৎকৃত হইল। বলিল—কথাটা তুমি খুব ভালই বলেছ। কিন্তু ও যেমন কায কৰ্ম্ম করে, তোমার তো তা’ অভ্যাস নেই—তুমি কি সেই রকম পার্‌বে? আর মাও বুড়ো মানুষ। বোঝ। সেই জন্যেই বলি—ও থাক্। ঝি রাখ্‌তে বল্‌চ’—তাকে মাসে মাসে যে টাকাটা দেব’—শালিয়ানা হিসেব কর’—তোমার তাতে একটা জিনিষ হবে। তুমিই ভেবে দেখ’—তাড়াতে বল’, আমি কালই তাড়িয়ে দিচ্ছি।

আন্না বলিল—না, সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। তুমি ওকে পাঠিয়েই দাও। কায তো ঢেঁকি। দুটি আর তিনটি মাত্র তো লোক—এ আমরাই করে’ কর্ম্মে’ নেব।

সতীশ প্রীত হইয়া বলিল—বেশ। সে ব্যবস্থা আমি কালই কর্‌চি। এর জন্যে আর ভাবনা কিসের?

রাত্রি প্রভাতেই সতীশ মাকে বলিল—মা, এদের দু'জনকে দুঠাঁই করে দেওয়া দরকার। নৈলে কোন্ দিন ফৌজদারী লাঠালাঠি করবে? তখন পাঁচজনে দাঁড়িয়ে হাসবে। এখন একটু একটু দু'চার কথায়, কখনও হচ্ছে—বাড়তে তো আর দেরী নাই। বিষ্ণুমুখুয্যেমশায় তো নূতন বৌয়ের নিন্দের আর বাকী রাখেন নাই। তিনি বলে বেড়ান—নতুন বৌ নাকি ওকে ধরে' মারে। কায কি? সতীন—

মা পুত্রের এই সুসম্বদ্ধ যুক্তিপূর্ণ কথার শেষ হইতে না হইতেই বলিলেন—বাবা, তুমি তো দেখ নাই আমার এক পিশেষ ছিলেন তাঁর এক সতীন ছিল, সে যে কুলুক্ষেত্র হতো সারাদিন—বাবা!

সতীশ বলিল—সে যাই হোক্ গে—এখন ওকে ওদের বাড়ীতেই পাঠিয়ে দাও; নৈলে নতুন বৌ থাকবে না।

স্থির হইল গৌরীকেই পাঠাইয়া দিতে হইবে। নতুন বৌ গেলে চলিবে না। গৌরী গেলে সতীশের সুখশান্তি হয়—সুতরাং মা দ্বিরুক্তি করিলেন না, কিন্তু মনটা খারাপ হইয়াই থাকিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৌরী চলিয়া গেলে প্রথম প্রথম কয়েকদিন আন্নাকালী সংসার-কার্য্যে খুব উৎসাহের সহিত মনোনিবেশ করিল।

শাশুড়ীকে বাড়ীঘর পাট করা বাসনমাজা জলতোলা প্রভৃতি লঘুকর্ম্ম দিয়া আপনি রন্ধন পরিবেশন আদি গুরুতর শ্রমসাপেক্ষ কার্য্যগুলি বাছিয়া লইল।

গৌরী থাকিতে এতকাল আন্নার যেন কেমন একটা অশ্বস্তি বোধ হইতেছিল, ঠিক মত সে যেন নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেছিল না। গৌরী কখনও আন্নার কোনও কার্য্যের প্রতিবাদ করে নাই বা তাহার কৃত কার্য্যে ঘুণাক্ষরেও অসন্তোষ প্রকাশ হইতে দেয় নাই—তবুও গৌরীর ক্ষীণহাস্যরেখালীন প্রসন্ন অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিলেই আন্নার আতঙ্ক উপস্থিত হইত, একটা অজ্ঞাতসঙ্কোচ আসিয়া জুটিত এবং সেই মূকপ্রায় অনলস কর্ম্মিণী রমণীর প্রতি একটা অকারণ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ইঙ্গিতে আন্নার সকল ঔদ্ধত্য মাঝপথে বাধাপ্রাপ্ত হইত। কাযেই গৌরীকে বিদায় দিয়া আন্না নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

কিন্তু এ সুখ বেশী দিন রহিল না। মাসখানেকের মধ্যেই সতীশ, তাহার মাতা এবং আন্না তিন জনেই বুঝিতে পারিল যে গৌরী গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনেকখানি সুখও সে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে।

অনভ্যাসের ছলনায় আন্না ক্রমশ রান্না খারাপ করিতে লাগিল—যাহাতে তাহার হাত হইতে এ ভারও খসিয়া যায়। খসিল না। এবার আন্না শিরঃপীড়ার ভাণ করিল

—তখন আর গত্যন্তর নাই! জননী এ রান্নার ভারও গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন বধূ ভাল হইলে আবার তাহার হাতে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু এ ব্যারাম আর আরোগ্য হইবার নাম করিল না। প্রত্যহ সকালবেলা ও সন্ধ্যাবেলা মাথার এত যন্ত্রণা হয় যে আন্না আর কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না, চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারে না—সময় সময় নাকি অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তিও শুনা যায়। দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে শরীরটা কতক ভাল থাকিত সেই সময়ে সে যৎসামান্য লঘু কার্য্য কিছু করিত। সতীশ তাহা করিতে বারণ করিল। তাহার আশঙ্কা, যে দুর্ব্বল শরীর কোন সময় পড়িয়া মূর্চ্ছা গিয়া না প্রাণ হারায়। আন্না শুনিত না তবু কোঁতাইতে কোঁতাইতে এক হস্তে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া, দুই একবার বসিয়া উঠান ঝাঁট দিত বা বাসন মাজিতে বসিত—সতীশ দেখিয়াই অমনি পত্নীর উপর মহা অনুযোগ জুড়িয়া দিত।

মাতাপুত্রে আন্নাকে হারাণ কবিরাজের ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কত সাধিল, কিন্তু আন্না তাহাতে রাজি হইল না, বলিল,—মেয়ে মানুষের কত অসুখ হয়, তার জন্যে কি আর ডাক্তার কব্‌রেজ ডাকতে হয়? ইত্যাদি। স্বামী ও শাশুড়ী বধূকে ইহাতে কতই না প্রশংসা করিলেন।

সে যাহাই হউক্, আন্নার অসুখও যেমন সারিল না, শাশুড়ীর হাত হইতে সংসারও তেমনি নামিল না।

কেবল যে সংসারের কাযই মার উপর পড়িয়াছিল, তাহা নহে। এই খাটুনীর উপর আবার পুত্রবধূর আজ্ঞাধীনতা ছিল। যদি ঠিক কথামত বা সময়মত কোনও কার্য্য না হইত তবে তাঁহাকে তার জন্য শত শত কৈফিয়ৎ দিতে আর অনেক বাক্যবাণও সহ্য করিতে হইত। রোগীর পথ্য, সুতরাং বেলা ১০টা ১১টার মধ্যে হওয়াই চাই—ওদিকে রাত্রি ৮টা। সতীশের মার প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইতে গেল—চিরকালই এইরূপ রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইয়া খাওয়াইয়াই তাঁহার দিন কাটিয়াছে—এখনও তিনি বিশেষ পটু; কিন্তু এই সময়ের বাঁধাবাঁধিতেই তিনি যেন বিশেষ অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। সময়ের সঙ্গে যে নাওয়া খাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে—এটা এতদিন তাঁহার ধারণাই ছিল না। তিনি জানিতেন রান্না হইলেই খাওয়ার সময়। কিন্তু একি? এ যে রান্না না হইলেও তাড়া দেয়; আবার কথনও রাঁধিয়া বাড়িয়াও এক প্রহরকাল বসিয়া থাকা! এটা তাঁহার কাছে নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল।

গৌরী যথন ছিল—তথন এ সব তাঁহাকে এক দিনের জন্যও ভাবিতে হয় নাই। সে যে হাতের কায কাড়িয়া লইয়া করিত! একা সে বিগত বারবৎসরকাল এই কায করিয়া গিয়াছে! তাহাকে পুনরায় আনিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু একদিন যাহাকে শত আয়োজনে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, আজ তাহাকে কি প্রয়োজনে ফিরাইয়া আনা

হয়? দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে!

এত আদরের পুত্র সতু—যার জন্য এত উপচার, এত ব্যাকুলতা, এত যন্ত্রণা—সেও একবার তার দুঃখিনী মায়ের পানে তাকায় না? অসুখ হইলে একবার জিজ্ঞাসা করে না—মা কেমন আছ? দশমীর দিন সুধায় না—মাগো জলখাবার কি আছে? কি, দ্বাদশীর দিন একবার খোঁজও করে না, যে হতভাগিনী বাঁচিয়া আছে কি না? বরং বৌয়ের হ'য়ে অন্যায় অকারণ ভৎ'সনা করে! বৌ সে তো পরের মেয়ে—নিজের পেটের ছেলেই সুধায় না যখন, তখন আর কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর এই সবে পাঁচ বৎসর সতীশ আন্নাকে লইয়া সংসার করিতেছে। ইহারই মধ্যে আন্নার ভিতরে সতীশ তাহার সেই আদর্শ নায়িকাকে আর খুঁজিয়া পাইতেছে না। যে মোহে এক দিন আন্নাকে সতীশ কল্পলোকের অসামান্য মানবী ভাবিয়া তাহার চরণে সমস্ত প্রীতিপুষ্প অর্ঘ প্রদান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছে—এতদিনে তাহার সে মোহ টুটিয়া গিয়াছে। এই পাঁচবৎসরের পূজার ফুল যেন এক বীভৎস মায়াবিনী রাক্ষসীর পদতলে তাহার স্বকৃত-আত্মাবমাননার কলঙ্ক শৈলের মত পুঞ্জীভূত হইয়া

সতীশকে নিষ্ঠুর পরিহাসে বিদ্ধ করিতে লাগিল। অল্প-বুদ্ধি সতীশ আগুন লইয়া খেলা করিবার সময় অপরকে দগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন ভাবে নাই যে একদিন এই বর্দ্ধিষ্ণু বহ্নিশিখা তাহাকেও আহুতি চাহিবে। আজ সে দিন আসিয়াছে—সতীশের হু'স হইয়াছে।

আন্নার স্বভাবই নিষ্ঠুর এবং অহঙ্কারী। কেহই যখন আর নিকটে রহিল না তখন সে সকল কথাতেই সতীশকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কোনও একটা কিছু হইলেই সতীশকে—পাড়াগেঁয়ে ভূত কি না? অথবা ঐরূপ একটা কিছু বলিয়া বসিত। সকলকে এইরূপ অবমানিত এবং ঘৃণা করিয়া আন্নার স্বভাবই এইরূপ উগ্র ও উদ্ধত হইয়া পড়িয়াছিল যে অনেক সময় সে নিজেই বুঝিতে পারিত না যে কাহাকে কি বলিতেছে বা এ কথার ফল কি দাঁড়াইবে। যদি সতীশ বুঝাইতে যাইত যে এ কথা গুরুজনকে বলিতে নাই ইত্যাদি—তাহাতে আন্না জিদ্ ধরিত ও অন্যায় রকমে তর্ক, যুক্তি, নজির প্রদর্শন করিয়া আপনার কথাই বজায় রাখিত। ভুল দেখাইয়া দিলে, আন্না তাহা সংশোধন করা দূরে থাকুক, ভুলকে ভুল বলিয়াই মানিতে রাজি হইত না—সুতরাং তার এ ব্যাধিও দুরারোগ্য।

সতীশ যতই অল্পবুদ্ধি হউক, এবং আন্নাকে যতই উপন্যাসের নায়িকার মত ভক্তি করুক—স্বামী হইয়া সদা সর্ব্বদা প্রত্যেক কথাতেই এরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং

অপমান আর সহ্য করিতে পারিল না। বহুকাল পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়াছিল—কিন্তু একদিন যে সে স্বামীর মত পত্নীকৃত এই অপমানের প্রতিবাদ করিতে উঠিয়াছিল—সেই দিন হইতেই আর কখনও ভ্রান্ত কাল্পনিক নায়কের অভিনয় করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সেই দিন হইতে তাহাদের প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ চলিতে সুরু হইল।

গতরাত্রে সতীশের মার প্রবল জ্বর। সকাল পর্য্যন্ত তাঁর সংজ্ঞা নাই। সতীশ কাছারী যাইবার আগে আন্না-কালীকে বলিল—মার তো ভয়ানক জ্বর। তাঁর জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই। এ বেলা তুমি রাঁধগে মাকে মধ্যে মধ্যে দেখো। আমিও শীগ্‌গির আস্‌চি।

আন্না শিরযন্ত্রণার আতিশয্য ভাণ করিয়া ক্ষীণ অনুনাসিক স্বরে উত্তর দিল—একে আমি মর্‌চি নিজের রোগের জ্বালায়, তার উপর আবার রেঁধো, রোগীর সেবা করো, রোগীকে দেখো—

সতীশ বাধা দিয়া উষ্ণ ভাবে বলিল—ওসব চালাকী তো অনেক হয়েছে, আর কেন? যদি না রাঁধ তো খাবে কি? আমি না হয় রাধাবল্লভের প্রসাদ খেয়ে আস্‌বো। আর ঐ যে আমার মা, এই পাঁচ বৎসর কাল তোমার সেবা করলেন আর তুমি তাঁর একদিন একটু জ্বর হ'লে দেখ্‌বে না? বল্‌তে লজ্জা হয় না? বদ্‌মাইস্ পাজী কোথাকার—বলিতে বলিতে সতীশ উগ্র হইয়া উঠিল।

আন্না তর্জ্জনী তুলিয়া, দাঁড়াইয়া সতীশকে রোষ-স্তম্ভিত স্বরে কহিল—দেখ' মুখ সাম্‌লে কথা করো। গাল মন্দ দিলে ভাল হবে না কিন্তু, আমি আগে থেকে বলে রাখ্‌চি।

সতীশ দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, রাগে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিল—খবর্‌দার, হাজার বার গাল দেব, খুন করব। আবার চোক্‌রাঙানো হচ্ছে? পাজী—বদ্‌মাইস্।

আন্না শয্যায় শুইয়া—ও বাবা গো, বাবা আমায় কোথা দিয়েছ গো দেখে যাও গো, ইত্যাদি আবেদন করিতে করিতে রোদন সুরু করিয়া দিল।

সতীশের রোষ-কষায়িত রক্তচক্ষু জ্বলিতে লাগিল। গর্জ্জন করিয়া উঠিল—চুপ্ কর্, বদ্‌মাইস্! এই সকাল বেলায় উঠে মরাকান্না জোড়া হচ্ছে।

আন্না থামিল না দেখিয়া সতীশ মুখ ভেংচাইয়া বলিল—বাবা,...বাবা,...বাবা তো খোঁজ খবর করে' কিছু রাখে না! কখনও একখানা একপয়সার পোষ্টকার্ড লিখে সুধোয় না! আবার...ফের্ কান্না?...এখনও চুপ্ কর্ বল্‌চি, নৈলে চাবকে পিঠের চাম্‌ড়া তুলে দেব!...দেখবো তোর কোন্ বাবা এসে রক্ষা করে?...

বলিতে বলিতে সতীশ সক্রোধে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সারাদিন সতীশ আর বাড়ী আসিল না। বৈকালে ফিরিয়া, মার ঘরে গিয়া দেখিল তখনও তাঁহার জ্বর ছাড়ে নাই—তেমনি জ্ঞানশূন্য অবস্থাতেই পড়িয়া আছেন। আন্না কোনও খোঁজ খবর লয় নাই। আন্নার এ হৃদয়হীন-ব্যবহার সতীশকে আজ মাতালের মত উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তারপর অমনি হন্ হন্ করিয়া একেবারে গৌরীর পিত্রালয়ে আসিয়া হাজির। একদিন যাহাকে বিনাপবাধে দুর্ব্বহ কলঙ্কের বোঝা মাথায় দিয়া স্বাধিকার হইতে বিদায় দিয়াছিল, আজ বড় দুর্দ্দিনে প্রথমযৌবনের চিত্তাধিকারিণী সেই দরদী দয়িতার নিকট পূর্ণ তিনবৎসর পরে, অতি-বড় অপরাধীর মত আসিয়া ধরা দিল।

গৌরীরা এ সব ঘটনা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল—কাযেই তাহারা তত বিস্মিত হইল না। কিন্তু গৌরী সতীশকে আবার আপনার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে পাইয়া আচম্বিত-পুলকে, অযাচিত-সৌভাগ্যে এবং অজানিত-আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল পড়িতে পড়িতে বসিয়া পড়িল। স্বামীকে দেখিয়া, পিতা-মাতার সমক্ষে অবগুণ্ঠন টানিতেও গৌরী ভুলিয়া গেল।

শ্বশুর শাশুড়ী অপরাধী জামাতাকে আপনার দুর্গ মধ্যে

পাইয়া প্রথমটা তো খুবই অভিমানের অভিনয় করিলেন। সতীশ পদলুণ্ঠিত হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল—তাঁহারা জল হইয়া গেলেন।

সতীশ গৌরীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে—শ্বশুর মহাশয় বক্রহাসির ও টেপাচোখের রঙকরা দুই একটি কথার কুঙ্কুমও জামাতার দিকে সেই সুযোগে ছুড়িয়া লইলেন।

সতীশের অধোবদন আরও ঝুঁকিয়া পড়িল।

কোথাও নবচুতমুকুলের গন্ধে ভরা, কোথাও সজিনা-ফুলের সুবাস ছড়ানো সান্ধ্য-পল্লীপথে গৌরী পতির অনুগমন করিল। আকাশে চাঁদ ছিল। চরণতলে শুষ্কপত্র মর্ম্মরিয়া উঠিতেছিল। একেলা পথের তরুবীথিতে মাঝে মাঝে পাখীর চকিত-কাকলিতে স্তব্ধ-সন্ধ্যার নিঃসঙ্গপথ ঝঙ্কারিয়া গুঞ্জরিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

গৌরী একেবারে বরাবর শাশুড়ীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। কক্ষ অন্ধকার। সতীশ বড়ঘরের চালের বাতা হইতে স্বল্পাবশিষ্ট একটুক্‌রা মোমবাতি পাড়িয়া আনিয়া তাহা জ্বালাইয়া দিল। গৌরী পতিগৃহে আবার দীপ জ্বালিল!

সতীশের মা চক্ষু মেলিয়া সেই অস্পষ্ট দীপালোকে গৌরীকে দেখিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন—ব-উ-মা-আ-। চক্ষু লাল, দৃষ্টি প্রসন্ন এবং আশীর্ম্ময়ী। কণ্ঠস্বর অতর্কিত,

জড়িত, শুষ্ক কিন্তু তাহা আত্মগ্লানি অনুতাপ ও লজ্জায় সকরুণ এবং মধুর। শিশুর ডাকের মত সরল এবং আশ্বাস পূর্ণ।

সতীশ জননীর কক্ষ হইতে যেমন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি নবীন বেহারা আসিয়া প্রাঙ্গণে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"দা" ঠাকুর গো কা'ল সকালে তো যাওয়া হচে' না! কা'ল কুনু বেহারাই যে'তে রাজি' নয়। পোওশু নিচ্চয় হবে।

সতীশ উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে কিরে কালই যে দরকার ছিল।

নবীন ধান্যেশ্বরীর প্রসাদে তখন বিশেষ প্রফুল্লই, বলিল, এজ্ঞে দা ঠাকুর তা বল্লে তো হচে' না। এ অপ্‌রাধ মাপ্‌ কর্‌তেই হবে। আমি তোমায় ঠিক্‌ বলে যেচি, পোওশু যদি কেরুকে না পাই—তা'লে আপনি নিচ্চয় জেনো বৌ ঠাক্‌রুণকে আমি একাই মাথায় করে পৌচে দেবেন। বলিয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

আন্না জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সব শুনিল।

তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়ে নাই। সতীশের মা সেই অল্পালোকে হারাণো জিনিষ ফিরিয়া পাওয়ার মত গৌরীকে পাইয়া আনন্দাতিশয্যে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। গৌরীর মুখে

চোখে দেহে হাত বুলাইয়া তাহার বর্ণের মলিনতা, শরীরের কৃশতা, লাবণ্যের হ্রাস আবিষ্কার করিতে করিতে স্নেহের চুম্বনে অজস্র আশীর্ব্বচনে এবং অকপট শুভকামনায় গৌরীকে একবারে মূঢ় করিয়া দিলেন। গৌরীর স্থির নির্ম্মল চিত্ততট আজ এই আশাতীত সৌভাগ্যে ও গৌরবে আন্দোলিত ও অভিভূত হইয়া অশ্রুধারায় গলিয়া ফলিয়া উছলিয়া উপচিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা চারিদণ্ড হইতে না হইতেই বহুদিনের অপরিষ্কৃত, স্থানে স্থানে জমা করা, আবর্জ্জনাগুলি মুক্ত করিয়া, আঙ্গিনাটি সুপরিষ্কৃত করিয়া, স্নানাদি সারিয়া, গৌরী পাকশালায় প্রবেশ করিল।

আন্না সকাল হইতে কয়েকবার এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া, কোনও একটি বাক্স খুলিয়া, কোনটি সজোরে বন্ধ করিয়া কোনও বাক্সের উপরে একখানি পুরাণো পাঁজি বা একখানি কম্বলের আসন ছিল, সে গুলিকে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া, খুব ব্যস্তভাবে আপনার ঘরে আসিয়া দুয়ার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার অপ্রসন্ন-রোষগম্ভীর প্রলয়-মেঘের মত স্তম্ভিত মুখশ্রী, স্ফীত-আরক্ত নেত্র, স্রস্ত-অবিন্যস্ততাম্রাভ চুল কতক উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া, উড়িয়া মুখে পড়িয়া মাথাটাকে খুব যেমন বড় দেখাইতেছিল, তেমনি তাহাকেও একটা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর মত করিয়া তুলিয়াছিল।

কাল হইতে সতীশের স্নানাহার হয় নাই বলিয়া গৌরী

যথাসম্ভব শীঘ্র রন্ধনাদি সারিয়া, সতীশকে খাওয়াইয়া শাশুড়ীকে লঘু পথ্য দিয়া, আন্নাকে ডাকিতে গেল। অনেক ডাকিল কোনও উত্তর পাইল না। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল—সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সতীশ ও তাহার মা দেখিতেছিল। সতীশ তর্জ্জন করিয়া বলিল—যে না খায়, না খাবে।···সাধাসাধি কিসের···চলে' এস···ফের দাঁড়িয়ে থাকে ?···

গৌরী অনিচ্ছিত মন্থরচরণে ফিরিল। সতীশ রৌদ্রে পিঠ দিয়া তামাক খাইতে লাগিল। মা দন্ত কড়মড় করিতে করিতে অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—বাপ্‌রে বাপ্।···কি পাহাড়ে বজ্জাৎ···এই পাঁচ বছরে আমার হাড় মাস ভাজাভাজা করলে ? সাত জন্ম ছেলের বিয়ে না হোক্, এমন বৌয়ে কায নেই···আ ছি ছি !

গৌরী ভাতে জল দিয়া রাখিয়া হেঁসেল তুলিল। আন্না অভুক্তই রহিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রত্যূষ। শ্রীপঞ্চমী। আমবাগানের অস্পষ্টকুহেলি ভেদ করিয়া জমিদারের বাড়ী হইতে নহবতের শানাই-য়ের ললিত-বিভাস রাগিণী সুপ্তপল্লীর রুদ্ধ-দুয়ারে আঘাত করিয়া করিয়া ফিরিতেছিল। দুর্ব্বাদলের মৌক্তিকমালা গড়াইয়া পড়িতেছিল। বৃক্ষশাখা প্রচ্যুত শিশিরবিন্দুগুলি

শুভদিনের পুলকাশ্রুর মত টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিতেছিল। বেহারা চারিজন ডুলিটি বাড়ীর সম্মুখে নামাইয়া ডাকিল—দা' ঠাকুর, দা' ঠাকুর গো!

সতীশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। গৌরী শাশুড়ীর পদপ্রান্তে নিদ্রিত ছিল—সে একবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—নব্নে এসেছে বুঝি?

সতীশ কোঁচার টেপ মুড়ি দিয়া দুয়ার খুলিতে খুলিতে বলিল—হাঁ তারাই এয়েচে!

বেহারারা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতে লাগিল।

আন্নার ঘরের দুয়ার ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। সতীশ হঠাৎ একটা তীব্র-বিকট গন্ধে চমকিয়া উঠিল। দুইপাঠ দুয়ার বিস্তারিত করিয়া খুলিয়াই অস্পষ্ট আলোকে সতীশ দেখিল—আন্না তাহার সমস্তদেহে কেরোসিন্ নিষিক্ত কাপড় জড়াইয়া পুড়িয়া মরিয়া রহিয়াছে। দেখিবা মাত্রই সতীশ "উ—উ—উ—উ" করিয়া কম্পিত অর্দ্ধোচ্চারিত শব্দে ধড়াস্ করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

সতীশের গোঙানি শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মা, গৌরী এবং বেহারারাও ছুটিয়া আসিল। আন্নাকালীর দগ্ধ মৃতদেহ দেখিয়া বেহারারা সরিয়া পড়িল। মা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; গৌরীও থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘামিতে ঘামিতে কেমন হইয়া গেল। ক্রমে অত্যল্প

সময়ের মধ্যেই প্রতিবেশীদের দ্বারা গৃহাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দাশরথি মুখোপাধ্যায় গ্রামের একজন মাতব্বর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি সকলকে চুপ করিতে বলিয়া ও-ঘরের দুয়ার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। কারণ দারোগা না আসা পর্য্যন্ত লাশের কোন প্রকার সংকার করা উচিত নহে—তাহাতে 'ফলং বন্ধনং,' এই মহাতথ্যটি পঞ্জিকান্তর্গত সংক্রান্তি পুরুষের ন্যায় নানা প্রকারে বুঝাইয়া দিলেন।

থানা এবং দারোগার নাম শুনিয়াই লোকে কাঁপিতে লাগিল। কাহাকে থানায় পাঠান যায় এবং সে ব্যক্তি উক্ত স্থানে গিয়া কি বলিবে এই বিষয়ে গভীর আলোচনা হইতেছে, এমন সময়, বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায়, ৪।৫ জন খোট্টা কনেষ্টবল এবং গ্রামের দুইজন চৌকীদার সহ স্বয়ং দারোগা-বাবু আসিয়া সশরীরে হাজির।

অপ্রত্যাশিতভাবে দারোগাকে দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, ঘন ঘন সবাই ঢোক গিলিতে লাগিল।

কাংলা চৌকিদার দেখাইয়া দিল—হুজুর এই সতীশ বাড়ুয্যে।

সতীশের মাথা ঘুরিতেছিল। তাহার মুখমধ্যে কে যেন এক মুষ্টি ছাতু ঢুকাইয়া দিয়াছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সতীশ নির্নিমেষ নেত্রে দারোগাবাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার গা দিয়া দর দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। সে যে জাগ্রত এবং এসব যে সত্য—এ কথা সে ধারণাই করিতে পারিতেছিল না।

দারোগা হুকুম দিল—বাধো। রামলগন তেওয়ারী হাতে যখন হাতকড়ি পরাইল তখন সতীশ—দোহাই দারোগা বাবু, আমি কিছু জানি না হুজুর—বলিয়া শিশুর মত প্রাণপণ উচ্চৈঃস্বরে দাঁতে দাঁতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে লাগিল। তেওয়ারীজী বাধা দিয়া হল্লা করিতে নিষেধ করিলেন।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মা কোথায় ?

সতীশের জিহ্বা ও তালু মরুবালুকার মত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, অতিকষ্টে রুদ্ধরোদনে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মাথা নাড়িয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল—আজ্ঞে ঐ ঘরে। দারোগাবাবু হীরাসিংকে উল্লিখিত ঘরে পাহারা দিতে আদেশ করিলেন।

ও ঘরে আর কে আছে ?

—আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। আর কেউ নাই বোধ হয়।

দারোগাবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রথম পক্ষের স্ত্রী ? আন্নাকালী দেবী তবে তোমার কে ?

আজ্ঞে সে আমার দ্বিতীয় পক্ষের।

সতীশের ভয় এবং মুখুয্যে মশায় প্রভৃতি প্রতিবেশী কয়েকজনের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল।

দারোগাবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—লাশ কোন্ ঘরে?

কাংলা চৌকিদার একলম্ফে দরজার নিকটবর্ত্তী হইয়া ঘর দেখাইয়া বলিল—এজ্ঞে এই ঘরে মা বাপ!

দোর খোল্।

কাংলা দুয়ার খুলিল। দারোগাবাবু ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। সিপাহীরা নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বাহির হইতেই দেখিয়া মুখের খৈনী ফেলিয়া দিল।

দারোগাবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সতীশের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ এবং স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া খাশ দারোগেয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—আন্নাকালীকে কে মেরেছে?

সতীশ ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিল—ও তো হুজুর দেখ্‌চেন আত্মহত্যা করেছে। কেরোসিন্ তেলে—

দারোগাবাবু এক ধমক্ দিয়া কহিলেন—মিথ্যা কথা ছাড়'। ঠিক ঠিক বল'।

সতীশের কণ্ঠ ঘর্ ঘর্ করিয়া উঠিল, চক্ষু নিষ্প্রভ, নিশ্বাস দ্রুত। সে বলিল—হুজুর, যথা ধর্ম্ম আমি বল্‌চি। এই ভোর বেলায় বেহারারা এলে, তাদের সাম্‌নেই আমি দোর ঠেলে দেখি এই!

—মিথ্যা কথা! তোমরা একে খুন করেছ।

সতীশ বসিয়া পড়িল। মাথা এমন ঘুরিতে লাগিল যে অল্পক্ষণেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

কক্ষান্তরে তাহার জননী ও গৌরী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

মুখুয্যে মশায়রা ভাবিতেছিলেন—কি মুস্কিলেই তাঁহারা পড়িলেন। তাঁহারা পলাইতে পারিলে বাঁচেন কিন্তু উঠেন কি করিয়া? উঠিতে গেলেই যদি "এই যাও কোথা" বলিয়া চাপিয়া ধরে? পুলিশ যে—ওরা কি বুঝ্‌বে যে আমরা নির্দ্দোষ প্রতিবেশী!

দশম পরিচ্ছেদ

সতীশের মুখে জলের ছিটা দিতে বলিয়া দারোগাবাবু প্রবীণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কহিলেন—আপনি একটু দয়া করে মেয়েদিকে চুপ কর্‌তে বলুন্। এখন আর বৃথা কাঁদাকাটী করে' ফল কি?

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধড়ে প্রাণ আসিল। অনেকক্ষণ এক জায়গায় একভাবে দাড়াইয়া দাড়াইয়া তাঁহার মাজা-কোমর চড়্ চড়্ করিতেছিল—একটু নড়িয়া বাঁচিলেন। মেয়েদের কান্না থামিল না, তবে স্বরটা কিছু নিম্ন হইল।

তখনও সতীশের জ্ঞানোদয় হয় নাই, দারোগাবাবু মুখোপাধ্যায়কে অত্যন্ত ভীত ও বিমূঢ়-বুদ্ধি দেখিয়া, তাঁহাকে কহিলেন—আপনাদের ভয় কি? আপনি কাঁপ্‌চেন কেন? মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁপুনি যেন আরও বাড়িল, তিনি প্রাণপণ শক্তিতে একটু হাসিতে চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু মুখব্যাদানেই পর্য্যবসিত হইল। কহিলেন—"হেঁ হেঁ, সে আপনার দয়া। আপনার দয়া।" বলিয়া সজল নয়নে হাতে হাতে সজোরে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দারোগাবাবু তখন তাঁহাকে সতীশ, সতীশের মাতা, আন্নাকালী ও গৌরীর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মত যতদূর সম্ভব সতর্ক হইয়াই উত্তর দিতে সুরু করিলেন; কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝিলেন যে এ দারোগাবাবু এখনও পাকা দারোগা পদবাচ্য হন নাই।

ইহার বয়স ২৬।২৭; অল্পদিন হইল রাঁচী হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন—লোকটি খুবই বিনয়ী এবং ভদ্র। তাহাতে সকলেরই যেমন অনেকটা ভয়-ভাঙার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল, তেমনি ভক্তিরও একটু ভাটা দেখা গেল। কারণ, পাকা দারোগা হইলে তাহার মুখে হাসি, ভদ্র-সম্বোধন এবং আলাপে শিষ্টতা থাকিবে কেন?

মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত চারিটি প্রাণী সম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহা যথাযথ সবই বলিলেন। দারোগাবাবু তাহাতে যেন কেমন চিন্তিত ও সন্দিগ্ধ—এইরূপ ভাব ধারণ করিলেন। একটু অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তা'হলে আপনার বিশ্বাস কি এঁরা একে হত্যা করেন নাই?

মুখো। না হুজুর, ও আত্মহত্যাই করেছে। আমি তো বল্‌লাম যে এ মেয়েটা ছিল পাড়াকুঁদুলী। এ পাড়ায়— এ

পাড়ায় কেন এ গাঁয়েই—কোনও ঝি বউ, এমন কি তার সমবয়সীরা পর্য্যন্ত এর ঝগড়া ও বদমেজাজের জন্য কাছে পর্য্যন্ত আসা ছেড়েছে। মিছেমিছি তাদিকে অপমান করতো। ইদানীং সে বেশী কথা কি, তার স্বামী শাশুড়ীকে পর্য্যন্ত অপমান করতো। প্রায়ই শুনতাম ঝগড়া ঝাঁটি। এ সব আস্পর্দ্ধা ঐ গরুটাই (সতীশকে লক্ষ্য করিয়া) তো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সতীশের মা বুড়োমাগী, সে নির্ব্বিচারে বৌয়ের এই সব অত্যাচার সহ্য করতো। বৌ তো এক পা নড়ে বসতেন না, ঐ বুড়ীই মরতে মরতে একা সংসারের সমুদয় কায করা থেকে রান্না বাড়া পর্য্যন্ত করতো। এতে পাড়ার লোকে বুড়ীকে কত নিন্দে পর্য্যন্ত করেছে কিন্তু ও তা গায়েই করে নাই। তাইতে মনে হয়—এ কায এদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তবে ভগবান জানেন—লোকের মনের কথা।

দারোগাবাবু নিরুদ্ধশ্বাসে সব শুনিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইবার হাসিয়া বিনয়সূচক শির আন্দোলন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা হুজুর, এত সব খবর জান্‌লেন কি করে ?

দারোগা বাবু একটু হাসিয়া বুকপকেটে হাত পূরিতে পূরিতে বলিলেন—জান্‌লেম কি করে ? এই দেখুন ! বলিয়া এক খানি পত্র মুখুয্যে মশায়ের হাতে দিলেন।

সতীশের তখন চৈতন্য হইয়াছিল। এতক্ষণ সে কথা-

বার্ত্তা শুনিতেছিল। মুখুয্যে মশায় মনে মনে পত্র পড়িতে লাগিলেন। অন্যান্য প্রতিবেশীরাও তাঁহার স্কন্ধদেশে চিবুক স্পর্শ করিয়া পত্র পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। দারোগাবাবু বলিলেন—জোরে পড়ুন, মুখুয্যে মশায়। সবাইকে শুনিয়ে দিন।

মুখুয্যে মশায় পড়িতে লাগিলেন——

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত দারোগাবাবু মহাশয়

শ্রীচরণেষু—

গত কল্য হইতে আমার স্বামী ও শাশুড়ীঠাকুরাণী আমায় খাইতে দেন নাই। এবং আমাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছেন। আমার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম হদিলপুর। এলাকা থানা চকদীঘি। আমাকে ইঁহারা ভয় দেখাইতেছেন যে আমাকে মারিয়া ফেলিবেন। তারপর আমার স্বামী আবার বিবাহ করিবেন। অতএব আপনার শ্রীচরণে নিবেদন এই যে পত্র পাঠমাত্র আসিয়া আমাকে খুন হইতে উদ্ধার করিবেন। আমি নিরুপায়। আপনি যেন অতিসত্বর পত্র পাঠমাত্র অতি অবশ্য অবশ্য আসিবেন। কাল বিলম্ব করিবেন না। ইতি ১১ই মাঘ।

নিঃ শ্রীমতী [illegible]কালী দেবী

গ্রাম হদিলপুর

পত্র শুনিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের ও অন্যান্য প্রতিবেশীগণের

মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। সতীশের মাথার মধ্যে একটা যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—তাহার চক্ষের সম্মুখে যেন পৃথিবীটা ঘুরিতে লাগিল। কান জ্বালা করিয়া উঠিল; কেবল শোঁ শোঁ এক শব্দ শুনিতে লাগিল মাত্র।

সতীশকে জোরে এক ধাক্কা মারিয়া হুঁস্ করান' হইল।

দারোগাবাবু সতীশকে পত্র দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কার হাতের লেখা।

অতিকষ্টে সতীশ উত্তর দিল—আমার মৃত পত্নীরই বটে।

সই কার?

সইও তো তারই বোধ হচ্ছে!

এ সত্যি?

কখ্খনো নয় হুজুর, এ সব তার বদমাইসী—বলিতে বলিতে দারোগাবাবুর পদ ধারণ করিয়া বলিল—এ সব তার সয়তানী, হুজুর। এ শুধু আমাদিকে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্যে।

দারোগা পদ ছাড়াইয়া লইয়া, কোমল স্বরে তাহাকে ধৈর্য্যধারণ করিতে বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পানে প্রশ্নপূর্ণ এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—আমারও তাই মনে হয়, হুজুর, এ সব তারই কারসাজী।

দারোগাবাবু একটু চিন্তিত হইলেন। এমন সময় গৃহ হইতে সতীশের মা আলু থালু বেশে ছুটিয়া আসিয়া দারোগা বাবুর সম্মুখে পড়িয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদে কহিতে লাগিলেন—বাবা, দোহাই দারোগা বাবা, তুমি আমার ছেলে। নারায়ণ জানেন, ধর্ম্ম জানেন, এই বাসিমুখে বল্‌চি বাবা আমরা কিছুই জানি না। গেল তিন দিন তো জ্বরে আমার সাঁনই ছিল না। সতু আজ দু'দিন থেকে আমারই ঘরেই শোয়। দোহাই বাবা বিশ্বাস কর' বাবা, যে মহাপাতকী মিথ্যা বলে তার যেন বেটা মরে, মহাব্যাধি হয়, সর্ব্বনাশ হয়, বজ্রাঘাত হয়। যে দিব্যি কর্‌তে বল' বাবা সেই দিব্যিই কর্‌চি—তামা তুলসী শালগ্রাম ছুঁয়ে বল্‌তে বল' তাও বল্‌চি বাবা—আমরা এর কিছু জানি না বাবা। নির্দ্দোষীকে কষ্ট দিও না বাবা, তা'তে তোমার ভাল হবে না—দোহাই বাবা!

সকলেই তাঁহাকে ধৈর্য্য ধরিতে অনুরোধ করাতে তিনি আরও অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন-- ওরে এমন কাল-সাপ দুধ কলা দিয়ে পুষেছিলাম গো বাবা! ওগো তুমি কোথায় আছ গো—ইত্যাদি।

দারোগাবাবু শেষে একটা ধমক্ দিলে তবে সতীশের মা কতক শান্ত হন্।

দারোগা খানাতল্লাসী প্রভৃতি অন্যান্য তদন্ত সারিয়া

কহিলেন—দেখো রামলছমন সিং তোম্ ঠিক্‌সে ইন্ লোককো লে আও।

সতীশের মাকে কহিলেন—চলুন্ থানায় তবে এখন তারপর যা হয় হবে।

পুলিশের দারোগা—সুতরাং মুখুয্যে মশায় তাঁহাকে একবার আড়ালে ডাকিলেন, দারোগাবাবু অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন—বলুন না এই খানেই বলুন্ না—যা বল্‌বার।

মুখুয্যে মশায় আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। দারোগাবাবু হাসিয়া একটু ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন—সেদিন আর নেই মুখুয্যে মশায়। আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও সাধ্য মতে এতটুকু অবিচার হ'তে দেব না—এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হোন্। (কনেষ্টবলের প্রতি) লেও, চলো! (পুনরায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি) তবে আসি নমস্কার।

সতীশের মা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—সে কি বাবা? আমি যে বামুনের বিধবা, আমি কি থানায় যেতে পারি? না, আমি কোনও জন্মে গিয়েছিলাম? আমরা গাঁয়ের শেষে ঐ হলা চাষার বাগান পর্য্যন্ত কখনও যাই নাই যে। তুমি জ্ঞানবান্ দারোগা হয়ে এ কি কথা বল্‌চ, বাবা?

কি কর্‌বো বলুন্—যেতেই হবে, আইন যে এই।

এবার আর তাঁর সম্ভ্রম রহিল না তিনি গালাগালি

সুরু করিয়া দিলেন। সকলেই অমনি হাঁ হাঁ করিয়া বন্ধ করাইল।

ভয়ে আতঙ্কে লজ্জায় এবং আকস্মিক এই মিথ্যা অপবাদের বোঝায় সতীশের মাথা নুইয়া পড়িল। পা' দুটা এত ভারি বোধ হইল যেন মাটি হইতে তাহাদিগকে উঠাইবার সাধ্য তাহার নাই।

এমন সময়ে আলুলায়িত নিবিড়-কৃষ্ণকুন্তলা, অযত্নাবৃতা দেহবল্লী, মলিনবস্ত্রপরিহিতা গৌরী শ্যাম-নিটোল বাহু প্রসারিয়া দারোগার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। গৌরীর মুখ ভারি, চোখ লাল জবার মত, গালে অশ্রুধারার সাদাটে' দাগ। তার কণ্ঠ নিষ্কম্প, দৃষ্টি স্থির, স্বর গম্ভীর, প্রতিজ্ঞা দৃঢ়। বলিল—দারোগাবাবু আমার স্বামী ও শাশুড়ী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।…আমি আমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক কর্‌বার জন্যে সতীনকে হত্যা করেছি।…আমি খুন করেছি…আমায় গ্রেপ্তার করুন্, আমি দোষী…সাজা আমার পাওনা।…এঁরা নির্দ্দোষী, এঁরা কিছুই জানেন না।—অপরাধীকে সাজা দিন্, ভগবান্ আপনার মঙ্গল কর্‌বেন।

চিরস্বল্পভাষিণী, সদা-সলজ্জিতা, সঙ্কোচময়ী গৌরীর এই প্রগল্‌ভতা, এই অসমসাহসিক হত্যা এবং এই আশ্চর্য্য স্বীকারোক্তি আর সর্ব্বোপরি তাহার মহিমাময়ী নারীশ্রীতে শক্তুভোজী হৃদয়হীন কনেষ্টবল হইতে দারোগা-

বাবু পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে নির্ব্বাক, স্তম্ভিত এবং মূঢ় হইয়া গেল।

* * * *

গৌরী হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইল।

সতীশের মা এত সহজে বিপন্মুক্ত হইলেন বলিয়া মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা তুলিয়া বলিলেন—বাবা পেটে পেটে এত? নতুন বৌটা বজ্জাত ছিল বটে, কিন্তু এমন ধড়ীবাজ ছিল না।

সতীশ হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—তাই ডাক্‌বামাত্র অমনি গুর্ গুর্ করে সেদিন চলে এল। অমন জলজ্যান্ত মানুষ-টাকে পুড়িয়ে মেরে ফেল্লে? অাঁ? আত্মার স্মৃতিতে সতী-শের চক্ষু সজল হইল।

গ্রামে কিন্তু যে শুনিল সেই বিস্মিত হইল; কেহ কেহ বলিল অসম্ভব! সে স্বামী ও শাশুড়ীকে বাঁচাতে গিয়েই এ দোষ নিজের মাথায় নিয়েছে।

কয়েকমাস পরে জেলখানা হইতে এক পরোয়ানা আসিল যে বিচারে গৌরীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে—সতীশকে সে জন্মের শোধ একবার দেখিতে চাহে।

‘সে মহাপাতকিনীর আর মুখদর্শন করিব না’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সতীশ তাহার উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দিল।

পুনর্ম্মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

নগেন বাবু যখন ডেপুটি ছিলেন, তখন তাঁহার মত "অহিন্দু" কেহই ছিল না। হিন্দুদের নিষেধ ত মানিতেনই না, মুসলমানেরাও তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইত। হিন্দুধর্ম্মের উপর এরূপ বিদ্রোহাচরণ তিনি প্রকাশ্যেই করিতেন। এখন পেন্সন লইয়া স্বগ্রামে আসিয়া অবধি হঠাৎ হিন্দুধর্ম্মের উপর তাঁহার ভক্তি অতি মাত্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে। তখন যতটা অশ্রদ্ধা ছিল, এখন ততটা কি—তদপেক্ষা অনেক বেশী শ্রদ্ধার ভাব তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের উপর হইয়াছে। জুতার সঙ্গে পেঁয়াজ পর্য্যন্ত তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন; শেষোক্ত পদার্থটির বাড়ীতে 'প্রবেশ নিষেধ' হইয়া গিয়াছে। এখন গ্রামের ভট্টাচার্য্য, টোলের পণ্ডিত, ঠাকুরবাড়ীর পূজারীদের সঙ্গে নগেনবাবুর সদা-সর্ব্বদাই শাস্ত্রালাপ হয়। ইঁহারা এতদিন নগেনবাবুর এত চক্ষুশূল ছিলেন যে, ইঁহাদিগকে মানুষ ভাবিতেও তিনি সন্দিহান্ হইতেন। এখন তাঁহাব এমন মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে সেই লোকগুলিই একেবারে পারিষদের পদে উন্নীত হইয়া গেল। গ্রাম্য-বালকেরা এজন্য নানারূপ হাসিতামাসা করিত; প্রবীণেরা হুঁকা টানিতে টানিতে

তাঁহাদের জ্যোতিষিক গণনা অভ্রান্ত দেখাইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিকে ঠেলিয়া গম্ভীরভাবে শিরশ্চালনা করিতে করিতে বলিতেন, "দেখ, আমি কত দিন আগে বলেছি; এ ত হ'তেই হবে।" গ্রামের মেয়েরা পথে ঘাটে বলাবলি করিত যে বাবা বৈদ্যনাথের স্বপ্নাদেশে নাকি নগেনবাবুর ধর্ম্মজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছে। যে যাহাই বলুক না কেন, গ্রামের এবং আশ-পাশে দশ ক্রোশ দূরের লোকেও নগেনবাবুকে যে একটি মহাপুরুষ ভাবিত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সকলের চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, ত্রিশ বৎসর কাল তিনি এমনি হাকিমী করিয়া আসিয়াছেন যে, এখন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবেন বলিয়া সরকারে যেমন জানাইলেন, অমনি কোম্পানি বলিলেন, "বেশ যাও—কিন্তু তোমাকে মাসিক তিন শত টাকা খোরাকী লইতেই হইবে।" যে কোম্পানী সকলের কাছ হইতে কেবল লইয়া থাকে, সেই কোম্পানীই ঘরে বসাইয়া বাবু নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে মাসিক তিন শতখানি মুদ্রা প্রদান করিতেছে! আর যখন তিনি সদরে একবার হাকিম ছিলেন, গ্রামের দীনুবাগ্দী, হরি ভট্‌চাজ, কানাই ময়রা, নন্দ তেলী সাক্ষী দিতে গিয়া স্বচক্ষে সকলে দেখিয়া আসিয়াছে, কত বড় বড় সব সাহেবেরা তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করে এবং টুপি খুলিয়া সেলাম দেয়। কাযেই চৌধুরী মহাশয় কি যে-সে লোক? এ সকল ত দেখা। ইহা ছাড়াও তিনি নিজ

মুখে কত কথা বলিয়াছেন—তেমন আর কেউ কখন পারে ত' নাই—পারিবেও না। এইরূপ নানা কারণে দুই বৎসরের মধ্যেই নগেনবাবুর অবতারত্ব দেশে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

গৃহিণী চিরদিনই স্বামীর নিকট হইতে একটু তফাতে থাকিতেন, এখনও আছেন। কারণ আতপ-চাউল ও কদলীসিদ্ধ খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার ভরসা হয় না। মৎস্য-প্রিয়তাই এরূপ বিশ্বাসের হেতু। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে, গৃহিণী বলিতেন, "যেমন চিরদিন করে আস্‌ছি তেম্‌নি করাই ভাল। আমার ধর্ম্ম উনি, আমার কর্ম্ম কিরু ও কানুর পরিচর্য্যা।"

কিরু ও কানু যথাক্রমে কীর্ত্তিকুমার ও কান্তিকুমার, দুইটি পুত্র। কীর্ত্তির আগে উপর্য্যুপরি চারিটি সন্তান মরিয়া যাওয়ায় কীর্ত্তিকুমার মায়ের কিছু বেশী আদরের। কীর্ত্তি কলিকাতায় থাকে, বি, এ, পড়ে, বয়স বাইস বৎসর। কীর্ত্তির পর আরও দুইটি সন্তান মহাকালকে দিয়া কান্তি। কান্তি কীর্ত্তির চেয়ে আট বৎসরের ছোট। সে গ্রামের এক ক্রোশ দূরে—নবগ্রামে যে এনট্রান্স স্কুল আছে, তাহাতে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। মঙ্গলগ্রাম হইতে প্রত্যহ গাড়ীতে যায় এবং গাড়ীতে আসে। আর হিরণ আট বৎসরের একটি মেয়ে। বেশ ফুট্‌ফুটে মেয়ে—এখনও তার বিবাহ হয় নাই।

মঙ্গলগ্রামের চৌধুরীরা বনিয়াদী বংশ। জমিদারীও অল্প নয়—নগেনবাবু এবং তাঁহার পুত্রেরাই ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনও অনেক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায় তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল; তাহা ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে—এই আন্দোলন যখন ঘনাইয়া উঠিল, তখনকার এই সমস্ত তুমুল বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কীর্ত্তিকুমার হঠাৎ একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িল। কথাটা কিছুদিন গোপন রাখিল। কিন্তু পূজার সময় নগেনবাবু যখন বার বার কীর্ত্তিকে বাটী আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন আর গোপন থাকিল না—প্রকাশ করিতে হইল। কীর্ত্তি পিতাকে লিখিল যে "সে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, যদি তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া হয়, তবে সে যাইতে পারে।"

পত্র পড়িয়া নগেনবাবু একবারে বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সদাপ্রফুল্ল হাস্যময়ী গৃহিণী মূর্চ্ছিত হইলেন; বাটীতে খুব কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

গ্রামে নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। সকলেই এ ক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয় কি করেন, দেখিবার জন্য

অত্যন্ত উৎসুক হইয়া রহিলেন। অনেকে জাতিপাত আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িল, যে চৌধুরী মহাশয় ছেলেকে ত ঘরে আনিবেনই। জমিদার যদি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, তবে কি উপায়ে তাহারা জাতি রক্ষা করিবে? কেহ কেহ এক একবার মনে করিল যে, নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবে। কল্পনা করিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল—একে জমিদার তাতে হাকিম। গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা হঠাৎ আত্মীয়-গৃহে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যাইতে লাগিল। যাহারা রহিল, তাহাদের কেবল এক কথা—জাতিরক্ষা সমস্যার সমাধান! মোড়লদের দাওয়ায়, আচার্য্যদের বৈঠকখানায়, তামুলিদের গদিতে, চন্দ্র মুদীর দোকানে, সর্ব্বত্রই বৈঠক—জমিদার না চটে অথচ জাতি রক্ষা হয়! সর্প বিনষ্ট হয়, অথচ যষ্ঠি অটুট থাকে!

নগেনবাবু কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। গৃহিণী শয্যা লইয়াছেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি অবিরত রোদন করিতেই থাকেন। বাড়ীর লোকে তাঁহাকে অনুরোধ-উপরোধ করিয়া হারিয়া গিয়াছে। জননীর বুকভরা সমস্ত স্নেহ যেন অশ্রুরূপে তাঁহার সারা দেহখানি নিঙড়াইয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি কাঁদেন, আর পরমেশ্বরকে গালি দেন। দুই দিন, চারি দিন, দশ দিন, পনের দিন কাটিয়া গেল। কর্ত্তা কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলেন, "আমরা 'একঘরে'

হয়েই থাক্‌ব। কিন্তু কিরুকে চাই। তুমি তাকে আস্‌তে লেখ—সে এখনি বাড়ী চলে আসুক। সে প্রাচিত্তির কর্‌বে, গোবর খাবে—সব কর্‌বে। তাকে আস্‌তে লেখ।” বলিতে বলিতে তিনি তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, জটাধারী বুড়োশিব প্রভৃতি দেবদ্বারে কত দিন কিরূপ ধন্না দিয়াছিলেন, কেমন করিয়া বেলের কাঁটায় বক্ষ বিদ্ধ করিয়া কালীঘাটের কালীকে বুকের রক্ত দিয়াছিলেন, তাহাই উত্থাপন করেন। কখন কখন বলেন-–“কিরু জন্মাবার আগে ত জাত ছিল, কৈ তখন ত কিরু হয় নাই? আজ কিরুকে ছেড়ে জাত রাখ্‌তে যাব? কেন?”

স্নেহ, জাতি সংস্কার ও ধর্ম্ম—সবার দাবী উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু সমাজ করিবে কেন? সমাজ যদি জননীর হৃদয়ের একবিন্দুও পাইত, তবে এই পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হইত। যাহাই হউক, এরূপ সময়ে নগেনবাবু ব্রাহ্মণদেরই শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কি ব্রাহ্মণেরা তখন তাহার কিছুই জানিতেন না, কিন্তু ‘ব্রাহ্ম হইয়াছে’ এই কথাতেই, এবং নগেনবাবু পর্য্যন্ত যখন জাতিনাশ আশঙ্কায় চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই সে ‘হওয়া’টাই অবৈধতম এবং হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ অমার্জ্জনীয়। এই ধারণায় মত দিলেন যে, এ ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুর অজ্ঞাত, সুতরাং কীর্ত্তিকে জাতিতে কোনও রূপেই আর লইতে পারা যায় না। নগেনবাবু প্রথম

হইতেই যদি কথাটা উড়াইয়া দিতেন, তবে বোধ হয়, এতটা গড়াইত না।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি নগেনবাবুর অন্তরটি যে কত আকৃষ্ট, তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বাহিরের বিজ্ঞাপন বিশ্বাস করিতে গেলে বলিতে হয় যে, তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু। যদি কোন একটা ভাল কায বা ভাল কথা পাঁচ জন লোকের অসাক্ষাতে হঠাৎ হইয়া যাইত, তবে যতক্ষণ তিনি সেটি সকলকে না বলিতে পারিতেন, ততক্ষণ তিনি বড়ই মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেন; কিন্তু এমন ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটিত না। বাহিরের উপর যে যত আসক্ত, সে তত করতালির ভক্ত। এই আত্ম-প্রচার অনেকটা উত্তেজনার ফলেও হয়, অনেকটা স্বভাবগুণেও হয়। ক্রমশ এটি যখন বেশ পরিপক্ক হয়, তখন বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই বিলুপ্ত হয়।

ত্রিশ বৎসর কাল হাকিমী করিয়া এবং হুকুম চালাইয়া নিজের নামের উপর তাঁহার একটা মমতা জন্মিয়াছে। গ্রামে মঞ্চহীন হইয়াও "পরম হিন্দু" বলিয়া তাঁহার যে একটা নাম হইয়াছে, ব্রাহ্ম পুত্রকে ঘরে আনিয়া তিনি সে নামটি মাটি করিতে শেষে একেবারেই ইচ্ছা করিলেন না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা মত দিলেন না—তাঁহাদের বিপক্ষাচরণ করিতেও আর সাহস নাই, কেন না এখনও তাঁহার একটি অবিবাহিতা কন্যা বর্ত্তমান। একে ত' তাঁহাকে গ্রামে

আসিয়া সমাজে ঢুকিতে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল, সে সবে এই দুই বৎসর হইল মিটিয়াছে। এখন পুত্রের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে গেলে কি জানি আর কি হয়,—নানারূপ দুশ্চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি জমিদার, বল প্রয়োগে হাত বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু মুখ বন্ধ করিতে পারেন না। হাত বন্ধ হইলে মুখ বেশী ফুটে। যদি এই সমস্ত ব্যাপার একবার পল্লবিত হইয়া রটে, তবেই কন্যার বিবাহ ত' অসম্ভব হইয়া পড়িবে। প্রজাগণের উপর বল প্রয়োগেও কুফল ফলিতে পারে, কারণ মন্দলোকের অভাব নাই। ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা করিয়া শেষে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া সব দিকই রক্ষা করিবেন, স্থির হইয়া গেল।

পুত্রকে পত্রে জানাইলেন যে, তাহার আর বাড়ী আসিবার দরকার নাই। তিনি তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছেন। গৃহিণীকেও এ কথা জানাইয়া বলিলেন, "তোমার ত অনেক ছেলেই মরেছে, মনে কর কিরুও মরেছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কীর্ত্তি যখন পিতাকে তাহার দীক্ষা-গ্রহণের কথা লিখিয়াছিল, তখন সে ভাবে নাই যে পিতা তাহাকে ত্যাগ করিবেন। সে যে কি আবেগে ও উত্তেজনায় ব্রাহ্ম হইয়াছিল, তাহা সে এখনও ঠিক জানে না। কীর্ত্তি ব্রাহ্ম

হইয়া সুখী হইয়াছে কি দুঃখিত হইয়াছে, তাহাও এখন, সে তলাইয়া বুঝিতে পারে নাই। তবে মোটামুটি সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই ধর্ম্মান্তরে সে তাহার ও তাহার পিতা-মাতার স্নেহের মধ্যে একটা অনুল্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উঠাইয়া দিয়াছে। এত দিন সে ছিল সবার পরিচিত আত্মীয়দের ভিতর আজ হঠাৎ সে যেন স্বপ্ন দেখিল—সে একা। পিতার পত্রে সে এমন অপ্রত্যাশিত কথা কথনও আশঙ্কা করে নাই বলিয়া তাহার অপ্রস্তুত হৃদয়খানি দুঃখে ও অভিমানে যেন অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পত্রপাঠ মাত্র সে একবারে পাথরের মত শক্ত হইয়া গেল। সে সব কথা ভুলিয়া গেল। অতীত বিস্মৃত হইল, বর্ত্তমান ঠাওর করিতে পারিল না—ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত ভাবনা গেল না। ভবিষ্যৎ একবারে নীরন্ধ্র অন্ধকার—কল্পনার যাইবার মতও একটুকু ছিদ্র নাই। কলিকাতার শত শত দীপালোক পলক মধ্যে নিবিয়া গিয়া, লক্ষ লোকের কল-কোলাহল যানযন্ত্র প্রভৃতির ঘর্ঘর শব্দ থামিয়া গিয়া—সে দেখিল, একটা প্রকাণ্ড শ্মশান, আর কীর্ত্তি তাহার মধ্যে একা।

কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তি প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল, সে কোথায়? এই আশাময়ী মহানগরীতে সে যে কুক্কুর অপেক্ষাও হীন! এখানে উচ্চতম ঐরাবত এবং ক্ষুদ্রতম কীটের স্থান আছে—নাই কেবল তাহার। তাহার প্রধান চিন্তা হইল, পিতা যদি

তাহাকে গ্রহণ না করেন, তবে সে কি করিয়া থাকিবে, খাইবে, কোথায় যাইবে? এই সমস্ত কথা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া কীর্ত্তি পিতাকে আবার এক পত্র লিখিল। স্বীকার-পত্রী সহ রেজেষ্ট্রী করিয়া দিল। পিতার স্বাক্ষরিত স্বীকার-পত্রী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পত্রের উত্তর আসিল না। প্রত্যহই প্রতীক্ষা করে, সে অভীপ্সিত পত্র আসিল না। তবু আশা ছাড়িল না। কীর্ত্তি ভাবিল, "মাসিক খরচ যাহা আসে, সেটা হয়ত নিশ্চয়ই আসিবে। কারণ, পিতা সাময়িক ক্রোধে বা লোকলজ্জায় কিছুদিনের জন্য আমায় ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু অনাহারে মরিতে বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে নিশ্চয়ই দিবেন না। বাবা যদি বেশী রাগিয়াই থাকেন, মা নিশ্চয়ই দিবেন।"

নির্দ্দিষ্ট প্রভাত হইল, সময় হইল, পিয়ন আসিল—চলিয়াও গেল; কিন্তু টাকা আসিল না। পিয়নকে জিজ্ঞাসা করায় আশানুরূপ সদুত্তর না পাইয়া পোষ্টাফিসে আসিয়া হাজির হইল। মনি অর্ডার বাবু কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিলেন, "পিয়নের কাছে খোঁজ করুনগে। যদি টাকা এসে থাকে ত সে নিয়ে আপনার বাসায় যাবে।" কীর্ত্তির চিন্তাপাণ্ডুর মুখখানি আরও মলিন হইয়া গেল—সে মুখ দেখিলে ডাকঘরের কেরাণীবাবুরও একটু দয়া হইত। কীর্ত্তি তবুও আশা ছাড়িল না—ভাবিল কোনও

কারণে পাঠান হয় নাই, এমন ত তুই একবার আগেও হইয়াছে। কিন্তু সপ্তাহ কাটিয়া গেল টাকা আসিল না। অন্ধকারে হস্তচালনার মত সে আবার পত্র দিল যে, "আমি অনাহারে মরিতেছি—আমার মেসের লোকে পুলিশে দিবে। শীঘ্র টাকা দিয়া আমায় রক্ষা করুন। যদি আর না দেন—এ মাসের খরচটা দিন, আমি শোধ করিয়া দিয়া, আপনার উপায় আপনি স্থির করিয়া লইব।" তাহারও কোন উত্তর নাই।

এতদিনের রুদ্ধ আবেগ এবার ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় ও অভিমানে স্ফীত হইয়া একবারে কীর্ত্তির সমস্ত বৃত্তিগুলিকে নাড়াচাড়া দিয়া দিল। কীর্ত্তি এখন সত্য সত্যই বিদ্রোহী হইল।

জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে পঞ্চাশটি টাকা ধার লইয়া মেসের বাবুদের তাগাদা হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু চলিবে কয় দিন? সে যে ভাবে বরাবর খরচ করিয়া আসিতেছিল, সে অনুপাতে অনেক কমাইয়া দিল, তথাপি, অর্থের অসচ্ছলতায় তাহার যে ভাবে থাকা উচিত সে ভাবটি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কীর্ত্তির খরচ কমাইয়া কষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু অন্যান্য লোকে বলিত— "বাবুয়ানার ত' কম দেখ্‌চি না!" কীর্ত্তি বিশ পঁচিশ— যাহা হয়—বেতনের একটি চাক্‌রী খুঁজিল—এমনি দুর্ভাগ্য, চাকরী একটিও মিলিল না। এ মাসও যায় যায়। এমন

সময় সৌভাগ্যক্রমে সে একজন বিধবাকে বিবাহ করিল। এতদ্বারা কীর্ত্তি একটা আশ্রয় পাইল—তুইটি আপাতত খাইতে পাইল। কীর্ত্তি বাঁচিল। পিতার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য—তাহার বিবাহ সে পিতাকে জানাইল।

কীর্ত্তির পত্নীর নাম সরোজিনী। বেশ সুন্দরী, বয়স ১৬ কি ১৭। কীর্ত্তির শ্বশুর শ্যামাচরণ রায়ও ব্রাহ্ম। ইনি কাশীতে ওকালতী করেন,—জামাতাকে তিনি নিজ ব্যয়ে পুনরায় কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। কীর্ত্তি বি, এ পাশ করিলে কাশীরই একটি স্কুলে ৬০ টাকা বেতনে হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজ সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পিতাপুত্রের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে হিরণেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কোনও রূপ গোলযোগ হওয়া দূরে থাকুক, নগেন বাবুর সৎসাহস ও ত্যাগের জন্য বিবাহসভা ঘন ঘন করতালি ও উচ্চ প্রশংসায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কান্তি এখন কলিকাতায় এম্, এ পড়ে। একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে একজন বিশ্বস্ত লোকের তত্ত্বাবধানে কান্তি কলিকাতায় থাকে, পাছে সেও আবার বিগ্‌ড়াইয়া যায়!

যে জননী পুত্রের বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় শয্যাগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন, এখন তিনি তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। মৃতের জন্য মনে স্বতই একটা সান্ত্বনা আসে, কিন্তু পরিত্যক্তের জন্য সে সান্ত্বনা আসে কি? কোনও বস্তু কাহাকেও দিলে দুঃখ হয় না, কিন্তু হারাইয়া গেলে দুঃখ হয়। পুত্রের শোকে জননী পাঁচ বৎসর কাল নানা পীড়ায় ভুগিলেন। চক্ষুর দৃষ্টি হ্রাস হওয়াতে ডাক্তার বলিয়াছে—কোনমতেই চোখে যেন আব জল না পড়ে; আর হৃদ্‌রোগের জন্য মনে স্ফূর্ত্তি রাখিতে স্বাস্থ্যকর দেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থা দিয়াছে। এই জন্য নগেন বাবু স্ত্রীকে লইয়া নানা তীর্থ ও সুন্দর সুন্দর শহর, যেমন দিল্লী, আগরা, জয়পুর, বরোদা, বম্বে প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। এই চর্ম্ম একদিকে কুসুম হইতেও যেমন সুকুমার, অন্য দিকে লৌহ হইতেও তেমনি সুকঠিন। চলিতে পায়ে বাজে, আবার তপ্ত লৌহশলাকার স্পর্শও তেমনি সহ্য হয়। শুধু একটা দাগ থাকে। গৃহিণীর হৃদয়েও তেমনি একটা শুধু দাগ আছে—পূর্ব্বস্মৃতির লবণ-সংযোগ হইলেই সময় সময় জ্বালা করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছয় মাস কাল যাবৎ নানা তীর্থ ও দেশ পর্য্যটন করিয়া কর্ত্তা ও গৃহিণী ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। উভয়ের মনের অবস্থাই অনেক ভাল। কিন্তু গৃহিণীর এ সংসার, এ সম্পদ, এ ঐশ্বর্য্য আর ভাল লাগে না বলিয়া তিনি কর্ত্তার

নিকট প্রায়ই অনুযোগ করিতেন যে, "এই বার চল কাশী-বাস করা যাক—সংসারধর্ম্ম ত আমাদের হলো!" প্রথম প্রথম কর্ত্তা এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতেন না, ক্রমে সংসার-ধর্ম্মের যৌক্তিকতা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—শেষে বলিতেন "কানু বি, এ, পাশ করুক—তার বিয়ে দিই, তার পর দেখা যাবে।"

কান্তি বি, এ, পাশ করিল। খুব সমারোহে কান্তির বিবাহও হইয়া গেল। কর্ত্তা কায-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু গৃহিণী বিবাহের পর হইতেই যেন অধিকতর বিমর্ষ হইলেন। যে আসিত তাহাকেই বলিতেন, "কিরু যদি আমার আজ ভাল থাকৃত, তবে তার কত ছেলে-পিলে হ'ত। আজ আমার ঘরে বাইরে ছুটাছুটি করে' এই নীরবপুরীকে সতত মুখরিত করে রাখতো।"

কর্ত্তার আর ওজর নাই। কাশী যাওয়াই স্থির। বিষয়-পত্র বন্দোবস্ত করিতে আরও ছয়মাস কাটিল। সত্য-সত্যই একদিন প্রভাতে একটি দাসী, একটি ভৃত্য ও একটি পাচক সঙ্গে লইয়া কর্ত্তা ও গৃহিণী কতক হর্ষে কতক বিষাদে, কতক ত্যাগে ও কতক মুক্তির দুঃখ-সুখে কাশী রওনা হইলেন। সেদিন কার্ত্তিকীপূর্ণিমার উষা। সূর্য্য তখনও উঠে নাই—পশ্চিম গগনে জমাট একখণ্ড জ্যোৎস্নার মত গত রাত্রের পূর্ণচন্দ্র মলিনাভ হইয়া বিদায়ের পূর্ব্বে ভাল করিয়া একবার পৃথিবীকে দেখিয়া লইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালীটোলায় একটি ছোট দ্বিতল বাড়ী নগেন বাবু ভাড়া লইলেন। বাড়ীখানি ছোট হইলেও ঘর অনেকগুলি ছিল। খুব সামান্য গলি ভাঙ্গিয়া আসিলেই একেবারে দশাশ্বমেধ ঘাটে উঠা যায়। বাড়ীর আশে পাশে অনেকগুলি পিতলের বাসনের দোকান, দুই একখানি ময়রার দোকানও ছিল।

প্রাতে মণিকর্ণিকায় স্নান ও আহ্নিক, স্নানান্তে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন, সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন এবং অবকাশকাল হরিনাম জপ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে একরূপ বেশ নিশ্চিন্তেই কাশীবাস করিতে লাগিলেন।

নগেন বাবুর বাড়ীর দক্ষিণ ধারে গরাদে দেওয়া একটা বড় জানালা ছিল। গৃহিণী এই জানালায় বসিয়া হরিনাম করিতেন, এবং যখন অবসর পাইতেন তখনই এই স্থানটিতে আসিয়া বসিতেন। এখানে বসিয়া তিনি চানাচুরের ডালা, বাসন বিক্রয়ের ঝাঁকা, খাবারওয়ালার মিষ্টান্নশোভিত বারকোশ, একা গাড়ীর ছাদ যেমন দেখিতেন, নানাবিধ বোল্‌চালও তেমনি শুনিতেন। আর দেখিতেন একটি ৩।৪ বৎসরের শিশু রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করে। বালকের পরিধানে একটি নিকার-বোকার, পায়ে ফুল মোজা ও বুট, মাথায় কখনও কখনও একটি On. H. M. S. লেখা

নীল রঙের টুপী। বালকটি গৌরবর্ণ, তার নাকটি বেশ দাঁড়াল, চোখ দুটি বড় বড় টানা টানা, হাসিখানি বেশ খদ্‌খদ্দে'। ছেলেটি বেশ শান্ত সুবুদ্ধি, দাইয়ের কাছছাড়া দূরে যায় না, দাই ডাকিলেই কাছে আসে। ছেলেটি বড় সুন্দর। ইহাকে দেখিতে দেখিতে গৃহিণীর মনে কত কথা, কত ভাব, কত স্মৃতি, কত মূর্চ্ছনার তরঙ্গ বহিত! মনের এ তোলাপাড়া একান্ত নিজস্ব বলিয়া যেন সে সব অব্যক্ত, অবচনীয়। এ যেন সুখ, এ যেন বেদনা! চৌধুরীগৃহিণী এ সবের মীমাংসা কিছুই করিতে পারিতেন না যদিও, তবু ইহাতে তিনি খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। আজীবনের জননী-সেবাপরায়ণ, চিরদিনের জননী স্নেহপ্রবণ হৃদয়খানি আজ এই ক্ষুদ্র অপরিচিত শিশুটির নিকটে এক বিরাট, সুন্দর এবং অপূর্ব্ব মাতৃত্বে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার মধ্যে নিজের অসীম কূলহীন নিজস্বটি দান করিয়া সার্থক হইতে তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। দিন দিন তিনি শিশুটিকে বেশী করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কোটরনয়ন দু'টি যেন ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিত। এ চক্ষের দৃষ্টি কত তৃষাতুর, কত বুভুক্ষু তাহা আর কেহই জানিত না। প্রত্যহ সকাল সাঁঝে গৃহিণী জানালায় বসিয়া বালকের ছুটাছুটি, হাততালি, অট্টহাস্য, নৃত্যভঙ্গী অতিশয় মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। বালক যখন তাহার হিন্দুস্থানী দাসীকে চুম্বন দিত—দাসী তাহার মুখ

বাড়াইয়া দিত, তখন কি জানি গৃহিণীর ওষ্ঠযুগলও এই দূর ব্যবধানেও সেই তালের সহিত সমতালে স্পন্দিত এবং প্রসারিত হইয়া উঠিত।

গৃহিণীর অপরিচিত শিশুটির প্রতি অযাচিত অদত্ত—রুদ্ধস্নেহ কর্ত্তারও কর্ণগোচর হইল। নগেন বাবু বলিলেন, "সব ছেড়ে কাশী এসেছ, না?" গৃহিণী তখনি ছল ছল নেত্রে, একটু করুণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আমার যে-সব জিনিস, তাই আমি ছাড়তে পারি। আমি যার, তাকে আমি কি করে ছাড়ি বল দেখি?"

এক দিন গৃহিণী নগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বড় ইচ্ছে, একবার ঐ ছেলেটিকে কোলে করে' কিছু খাওয়াই। অই দেখ রাস্তায় ঐ বাসনও'লার দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌চে; ডাক্‌বো?" বলিয়া তিনি জানালার দিকে অঙ্গুলি ফিরাইয়া বালককে নির্দ্দেশ করিলেন। নগেনবাবু বলিলেন, "ও কে, কি জাত, কার ছেলে, কিছু জানি না—বাড়ীতে আন্‌বে, তা' পরে ওর বাপ মা যদি চটে যায়? ও সব কর্‌তে যেয়ো না, ঠক্‌তে হবে, অপমানিতও হতে পার।" গৃহিণী অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"তাও বটে, ধর যদি না-ই আসে!" বলিয়া একটি নাতিদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

সে দিন গৃহিণীর গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতে কিছু দেরী হইয়া গিয়াছিল। স্নানান্তে বাড়ী ঢুকিতেই তিনি দেখিলেন

যে দাই সে ছেলেটিকে কোলে করিয়া তাঁহাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে। পথে বড় ভিড়, কতকগুলি লোক বাজনা বাজাইয়া একটি শব লইয়া যাইতেছিল, তাই সে ইহাদের দুয়ারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৌধুরী-গৃহিণী আর প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না, দাসীকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিলেন। দাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেয়া মাইজী ?"

গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "তুমি কোন্ বাড়ীতে থাক ?" দাসী বলিল,—"ঐ লাল বাড়ী যে আছে, সে বাড়ীতে হামি থাকে।"

"সেই বাবুর এ ল্যাড়্কা ?"

"হাঁ, সেই বাবুর।"

"সে বাবু কি করেন ? ও কি বাবুর নিজের বাড়ী ?"

"আমার বাবু তো গুরু আছেন্,—এ ছেলিয়া তাঁকর।"

বৃদ্ধা কি বুঝিলেন জানি না, মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ওঃ, বুঝিচি।"

দাসী বলিয়া চলিল—তাহার মুখ ফুটিয়াছে—"বাবুর বহু আছে, এই ছেলিয়া আর একঠো ল্যাড়কী ভি আছে। সে বহুৎ ছোটা।"

বালক দাসীর পিঠ ঠেলিয়া, যাইতে ইঙ্গিত করিতেছিল, দাসী ধম্‌কাইয়া বলিল—"আরে, রঃ ভূং মাৎ কর্।" বালক হতাশ হইয়া বৃদ্ধার মুখ পানে চাহিল। তিনি হাতের ভিজে কাপড়খানি উঠানে রাখিয়া বালককে কোলে লইবার

জন্য হাত বাড়াইলেন। বালক দাসীর কাঁধে মাথা রাখিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধা বলিলেন—"ওমা, এস এস,—লজ্জা কি?" বলিয়া হাত ধরিয়া টানিলেন—বালক আরও দৃঢ়তর বেগে দাসীকে আঁকড়িয়া ধরিল। দাসী তাহাকে একটা নাড়া দিয়া বলিল—"যা যা,—মাইজী বোলাওয়ে।" বালক মুখ লুকাইয়া খুব ছোট করিয়া বলিল "নেই তুই চল্।" দাসী বলিল, "নেহি যাবে মাইজী, বড়া বদমাশ। গৃহিণী বালকের হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, থাক্ থাক্।"

"আপনি হামাদের ডেরা চল্‌বেন্? হামি তবে মাইজী কি বোল্ দেবে এথ্‌নি।"

দাসীর কথা শেষ হইতে না হইতেই গৃহিণী বলিয়া ফেলিলেন—"যাব, যাব—আজ দুপুর বেলাতেই যাব। তোমার মাইজীকে বলো।" এমন সময় নগেন্দ্রনাথ বাটী প্রবেশ করিলেন, দাসী চলিয়া গেল।

নগেন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই যে গ্রেপ্তার করে ফেলেছ দেখ্‌চি। তাই বুঝি আজ এখনো আহ্নিক পূজাও হয় নাই!" আহ্নিক পূজার কথা যে গৃহিণীর মনেই ছিল না! কি ভীষণ ভুল! তিনি যে, ওদের ঝিকে ছুঁইয়া ফেলিয়াছেন! ভাবিয়া তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শেষে বলিলেন, "আজ দুপুরে আমি ওই বাড়ীতে বেড়াতে যাব, দাইকে দিয়ে বলে দিলাম।"

নগেনবাবুরও ছেলেটিকে ভাল লাগে। অনেক সময় তাঁহারও মনে হইয়াছে যে একবার ওকে কোলে করেন, কিন্তু সে তাঁহার হয় নাই। তাই তিনি বলিলেন; "বেশ, যেয়ো, সে এখুনি তো আর নয়?" অন্য সময় বা অন্য কোথাও হইলে নগেনবাবু তাঁহার পত্নীকে বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও পাঠাইতে অপমান বোধ করিতেন, এবং এরূপ জঘন্য প্রস্তাবের জন্য পত্নীকেও কড়া কড়া দুষ্ট কথা শুনাইয়া দিতেন। হয় ধন্য কাশী, নয় ধন্য স্নেহ—অথবা উভয়ই ধন্য! নগেন্দ্রনাথ আর সে দাম্ভিক গর্ব্বিত নগেন্দ্রনাথ নহেন। কে তাহার আজ সে গর্ব্বে পদাঘাত করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"আমি সব কাজ-কর্ম্ম সেরে অনেকক্ষণ আপনার আশায় থেকে হতাশ হয়ে পড়্‌লাম, ভাবলাম তবে বুঝি আর এলেন না। তাই কেবল উপরে যাবার জন্যে উঠ্‌ছি। দেখি আপনি এসে পড়লেন্। গরীবদের ভুলেন নাই তবে।"

"না মা, ভুল্‌বো কি? সে কি কথা? আজ আমার সব কাযেই কেবল দেরী হয়ে যেতে লাগ্‌ল। যত মনে করি শীগ্‌গির কায সারি, তত কাযের মুখে দ' পড়ে। অন্য দিন এমন সময় কোন্ কালে খাওয়া দাওয়া সব শেষ হয়ে যায়।"

"তা হয়, তাড়াতাড়ি কায করবো মনে করলে বেশী দেরী হয়েই যায় বটে।"

বলিতে বলিতে দুই জনে নীচ হইতে উপরের দালানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী-গৃহিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন একটি যুবতী। তাঁহার বয়স ২৩।২৪, বর্ণটি বেশ মার্জ্জিত গৌর, কিন্তু অযত্নে কিছু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। নাসিকার মধ্যস্থলটি একটু চাপা, চোখ দু'টি টলটলে ভাসা-ভাসা—টানা—সুনীল। চিবুকাগ্রের সূক্ষ্মতায় যুবতীর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে। সুগৌর অব্রণ মসৃণ গাল দু'খানি, হাসিতে গেলেই কুঞ্চিত দু'টি বিন্দু স্পষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্য-সুষমার ঘূর্ণবর্ত্ত সৃষ্টি করে। মাথায় অবেণীসম্বদ্ধ মুক্ত চিক্কণ কেশরাশি অবগুণ্ঠনহীনতায় দুষ্ট শিশুর মত চোখে মুখে পড়িয়া সময়ে সময়ে যুবতীকে বড়ই উত্যক্ত করিতে লাগিল। পোষাকের মধ্যে পরিধানে একখানি কালা-পেড়ে ফরাস্‌ডাঙ্গার শাড়ী, তন্নিম্নে একটি সাধারণ বাজারে' শেমিজ। কানে দুইটি ইহুদী মাকড়ী, হাতে চারিগাছি করিয়া সোনার চুড়ী, বাম অনামিকা অঙ্গুলে একটি বগ্‌লস্ প্যাটার্ণের অঙ্গুরীয়। যুবতীর নাম সরোজিনী, সেই বালকের জননী।

বাড়ীটি খুবই ছোট। নীচে দুই খানি ঘর ও উপরে দুই খানি। নীচের একখানি ঘরে রন্ধনাদি ও অপরখানি স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়। উপরের দু'খানি শয়নকক্ষের

যোগ্য, তন্মধ্যে একখানিকে বসিবার ঘর স্বরূপে ইঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। গৃহে আস্‌বাব্‌-পত্রও যৎসামান্য, কিন্তু তাহা সত্বেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—একটা মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের বেশ পরিচয় দিতেছে। ঘরও বেশ পরিসর। মধ্যে একখনি টেবিল, তাহার পার্শ্বে তিন খানি চেয়ার। টেবিলের উপরে কতকগুলি ঔষধের শিশি, আধখানা বেদানা, কিছু কিস্‌মিস্‌—ও অন্য ধারে শ্লিপের মত ছোট ছোট কতকগুলি কাটা কাগজ এবং একটি দোয়াত ও কলম। প্রাচীর-গাত্রে কয়েকখানি ছবি —তন্মধ্যে একখানি মহাত্মা রামমোহন রায়ের, একখানি ভগবান্‌ যীশুর, একখানি একটা ব্যাঘ্র-শীকার, একখানি সমুদ্রের,—এইরূপ আরও কয়েকখানি। আর এখানে ওখানে কতকগুলি ফটোগ্রাফ্‌ও গৃহগাত্রে বিলম্বিত ছিল।

সরোজিনী চৌধুরীগৃহিণীকে লইয়া এই বসিবার ঘরেই প্রবেশ করিল, কারণ যৎসামান্য আস্‌বাব পত্র যাহা আছে, তাহা এইখানেই। ঘরের উত্তর দিকে একখানি পালঙ্কে একটি রোগী। রোগীকে মানুষ বলিয়া মনে হয় না, কেবল কতকগুলি চর্ম্মাবৃত অস্থিপঞ্জরের সমষ্টি। আকণ্ঠ একখানি সাদা চাদরে ঢাকা, কেবল মুখটি খোলা। মুখের মধ্যে কেবল দাঁড়াল' নাকটি ও কোটরগত চক্ষু দুইটি ছাড়া সহসা আর কিছুই নজরে পড়ে না। অর্দ্ধবর্ষ ধরিয়া মৃত্যুর

সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া পরাজিত না হইয়াও পরাজিত,—এতই ক্লান্ত, এতই ক্ষীণ, এতই শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে!

ঘরে ঢুকিয়াই দক্ষিণ দিকে পাতা একটা শতবঞ্চে দুইজনে গিয়া বসিলেন। যুবতী বেশ হাস্যময়ী,—সরল ও অকুণ্ঠ। এই অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গৃহিণীর সঙ্গে রমণীটি সহজভাবে কথা ফাঁদিতে পরিয়াছে। সরোজিনীর বড় একটা কু-অভ্যাস আছে যে, সে সর্ব্বদাই হাসে, এবং কোন কথা সে পেটে রাখিতে পারে না; এই জন্য অনেক সময় সে তাহার সঙ্গিনীসমাজের গুপ্ত মন্ত্রণাদিতে যোগদান করিতে পাইত না,—অনেক আবেদন নিবেদন শপথ করিয়াও না। ছয়মাস আগেও এইরূপ ছিল। এখন কিন্তু সে ভাবটা ঠিক যেন খেলে না, পদে পদে ব্যথাব্যাহত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ফুটিতে পারে না। সরোজিনী লোকের কাছে তবু ব্যথিত বলিয়া ধরা দিতে চায় না; সে শুধু হাসির প্রলেপে প্রাণের ক্ষতকে লোক লোচনের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিতে চায়।

সরোজিনী যেমন গৃহিণীকে ধরিয়া জোর করিয়া বসাইল, অমনি গৃহিণী বলিলেন, "মা তোমার খোকা কই? সেই তো আমাকে এখানে এনেছে।" সরোজিনী বলিল, "আপনি আস্‌বেন বলে আমি তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি, নইলে বড় ত্যক্ত কর্‌বে। আপনার বুঝি তাকে ভাল লাগে?" গৃহিণী বলিলেন—"ভাল লাগে আবার

বল্‌ছো! তাকে দেখ্‌লে যে আমি সব ভুলে যাই। আমার মনে হয়, আমি তাকে সারাদিনই কাছে রাখি।”

সরোজিনী বলিল, “বেশ, এইবার হ’তে রাখ্‌বেন।” রোগী এই সময় দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। গৃহিণী এদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ছিলেন।

তার পর অনেক কথা হইল। যুবতী যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—তাহার স্বামী কাশীর একটি এণ্ট্রান্স্ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ; তাঁহার পিতা এখানে ওকালতী করিতেন, বাড়ী কলিকাতা। ইঁহারা ব্রাহ্ম। যুবতী শ্বশুরালয়ে কখনও যান্ নাই ; শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁহাদের পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছেন ; তাঁহাদেরও অবস্থা খুব ভাল। সম্প্রতি ইঁহাদের অর্থকষ্ট খুব বেশী ; কারণ একে এই দীর্ঘ কাল রোগীর চিকিৎসা, তার উপর একটি ছেলে একটি মেয়ে, এই বাড়ী ভাড়া, ঝি প্রভৃতির বেতন, কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতেছে না। সরোজিনীর দুই ভা’য়ে মাসিক ৫০৲ টাকা সাহায্য করেন—তাঁহারা কলিকাতায় উকীল, তাই কোনও রকমে দিন কাটিতেছে, নচেৎ রোগীকে হাঁসপাতালে দিয়া পুত্রকন্যা দু’টিকে লইয়া দ্বারে দ্বারে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইত।

যুবতীর হাসি অভ্যাস। সে হাসিতে হাসিতেই এই করুণ কাহিনী বিবৃত করিল। এ হাসি যে কি গরিমাময়, কি বেদনাপূর্ণ, কি সুন্দর, তাহা যাহারা হাসিমুখে বেদনা

সহ্য করিতে পারে, তাহারাই বুঝে! বৃদ্ধা আগাগোড়া অশ্রুজলেই এ ইতিহাস শুনিলেন। এমন সময়ে কন্যাটি উঠিল; যুবতী তাহাকে আনিতে কক্ষান্তরে গেল। বৃদ্ধা তখনও ঝাপ্সা চোখে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। রোগীর পানে চাহিতেই চারি চক্ষু এক হইল। কিছুক্ষণ দুইজনে দুইজনের পানেই চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া যখন পুনর্ব্বার চাহিলেন তখন রোগী এদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইয়াছে, দেখিলেন।

যুবতী রোরুদ্যমানা কন্যাকে লইয়া আসিল। মেয়ের বয়স দেড় বৎসর। যেখানে বসিয়াছিল, সরোজিনী আসিয়া পুনরায় সেই খানেই বসিয়া কন্যাকে দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। বৃদ্ধা তখন সংক্ষেপে আপনার বাড়ীর কথা পাড়িলেন। সব কথা ছাড়িয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে, অর্থাৎ কীর্ত্তিকে কি করিয়া হারাইয়াছেন তাহাই বলিতে লাগিলেন। কীর্ত্তিকুমার নাম শুনিবামাত্র সহসা যুবতীর মুখমণ্ডল আরক্ত, উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—চৌধুরী-গৃহিণী তাহা লক্ষ্য করিলেন। ঠিক এই সময় ঘড়িতে চারিটা বাজিল—যুবতী রোগীকে ঔষধ দিতে গেল, আর সেই বালক এক হাতে একটি রবারের বল্ ও অন্যহস্তে একটা ভাঙ্গা লাঠি লইয়া খালি পায়ে ধীরে ধীরে আসিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিল। গৃহিণীকে দেখিয়া বালক একটু লজ্জিত হইল, ডাকিল, "মা"।

মা বলিল—"যাও বোন্‌টিকে খেলা দাওগে, আমি যাচ্ছি।"

বালক আসিয়া নীরবে শতরঞ্জীর উপর শায়িত ক্ষুদ্র ভগ্নীটির কাছে বসিল। গৃহিণী ডাকিলেন, এবার বালক কাছে গেল। বৃদ্ধা অজস্র চুম্বন-ধারায় বালকের মুখমণ্ডল ছাইয়া দিলেন।

ঔষধ দিয়া যুবতী চুপে চুপে স্বামীর সহিত কি একটু কথা কহিয়াই চলিয়া আসিল।

যুবতী ফিরিয়া আসিলে বৃদ্ধা তাহাকে বসিতে না বসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মা, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়, তবু নাম তো শুনেছ।" যুবতী বলিল—"নদে জেলার মঙ্গলগ্রাম।"

বৃদ্ধা এই কথা কয়টি শুনিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসম্বদ্ধ বস্ত্র ও চোখ-মুখের উন্মাদ দীপ্তিতে বালক ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণীর সে দিকে দৃক্‌পাত নাই; তিনি ডাকিলেন—"কিরু" "কিরু"—স্বর কি তীব্র, কি মধুর!

রোগী বস্ত্রমধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল "মা—মা"!

দ্বীপান্তর

প্রথম পরিচ্ছেদ

কি করিবে? বেচারার অদৃষ্টে ছিল, তাই এমনটা ঘটিল। পুলিশের কাছে রামু কেবল বলিল যে, সে নির্দ্দোষী। পুলিশ কেন,—কেহই সে কথা বিশ্বাস করিল না।

অন্ধকার রাত্রি—রামু একা যাইতেছিল। এমন সময়ে পথ-পার্শ্বের একটা ঘর হইতে কার গোঙানি শুনিতে পাইয়া প্রথমটা সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া খানিকক্ষণ শুনিল; দেখিল যে সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ থামেও না, কমেও না। রামু সে বাড়ীর কড়া নাড়িয়া একবার শব্দ করিল, কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল না; দ্বিতীয়বার কড়া নাড়িল, তবুও সাড়া নাই। পাড়া নিশুতি—কাহাকেই বা সে ডাকে, কি করে, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া রামু সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দুয়ার খোলাই ছিল।

উঠানে দাঁড়াইয়া "কে আছ গো" বলিয়া দুই তিন বার সে ডাকিল—তবুও কেহ উত্তর দিল না। অথচ ঘরে সেই গোঁ গোঁ শব্দ। একে অপরিচিত জায়গা, অজানা বাড়ী, এই দু'পুর রাত্রি,—রামুর গা'টা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল।

কিন্তু সে হটিবার পাত্র নয়। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কিছুই দেখা যায় না। ঘুটঘুটে অন্ধকার। রামুর গায়ে একটা পিরাণ ছিল—তার পকেটে দিয়াশলাই ছিল। দিয়াশলাই জ্বালিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তবুও কম্পিত-হস্তে কাঠি জ্বালিয়া সে একটি কেরোসিনের ডিবে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালিল।

রামু দেখিল—তক্তাপোষে একজন পুরুষ তিন চারি টুকরা করিয়া কাটা। রক্তে বিছানা, ঘর সব লাল। মৃতের মুখ বিকৃত, চিনিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। মেঝের উপর একটি যুবতী, হাত-পা-মুখ সব বাঁধা—কেবল গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। তৈজসপত্রাদি সমস্ত এলোমেলো, বিধ্বস্ত, চারিদিকে ছড়ান। কাঠের একটি বড় সিন্দুক আছে, সেটাও ভাঙ্গা।

রামুর আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। ডাকাতেরাই রমণীকে এইরূপ বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে এবং অনুমানে বুঝিল যে হতব্যক্তিই গৃহ-কর্ত্তা—এই রমণীর স্বামী।

রামু সর্ব্বপ্রথম যুবতীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, বাহির হইতে জল আনিয়া, জলের ছিটা দিয়া, তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিল। রমণী সুস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সেই শব্দে পাড়া-পড়শী সকলেই আসিতে আরম্ভ করিল।

"ডাকাত, ডাকাত, খুন্ খুন্" শব্দে অদূরবর্ত্তী ফাঁড়ি হইতে পুলিশও আসিয়া হাজির। এই অসময়ে অপরিচিত জনসঙ্ঘের ভিতরে এই ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়িয়া রামচন্দ্র একবারে হতভম্ব হইয়া গেল।

এই পলায়নে-অক্ষম অপরিচিত ব্যক্তিই যে পলায়িত দস্যুদলের একজন—ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না, পুলিশের জমাদার-সাহেবেরও না। তখন সকলেই অকাল-নিদ্রাভঙ্গের রাগটা রামুর পৃষ্ঠের উপর কতকটা মিটাইয়া লইল—হিন্দুস্থানী জমাদার-সাহেবও ভাঙ্গা বাংলায় তাঁহার বাংলাজ্ঞানের বাছাই নমুনাগুলি রামুর উপর প্রয়োগ করিয়া মুখে খানিকটা "খৈঁনী" পূরিয়া দিলেন।

প্রহারে, গালিতে, অপ্রত্যাশিত আকস্মিক এই বিপদে, বিড়ম্বনায় রামুর মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়া পড়িল। ততক্ষণে চোবেজী-সিপাহী এক নিশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ফাঁড়ি হইতে হাতকড়ি লইয়া আসিল।

[illegible] মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়াইয়া দিল; তাহার পর তাহাদের অগ্রে অগ্রে গিয়া থানায় উঠিল। শেষে হাজত-ঘরে ঢুকিতেও দ্বিধা করিল না।

হাজতের এক ক্ষুদ্র কক্ষে, কত কত দিনের কত কত দোষী-নির্দ্দোষীর সুগভীর মর্ম্মতাপের বদ্ধ-বাতাসে রামুর যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। সে তাহার নিজের অবস্থার আলোচনা করিতে চায়, কিন্তু তাহার কোন সূত্রই পায় না।

রামু ভাবিল কি ঘোর দুঃস্বপ্ন! "দুঃস্বপ্নে স্মরে গোবিন্দ" বলিয়া চক্ষু মুছিল—চারিদিকে একবার হাত বুলাইয়া দেখিল যে, এ স্বপ্ন নয়—কঠোর সত্য। সে আর থাকিতে পারিল না, শিশুর মত গুমরিয়া গুমরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া যে কোনও ফল নাই, তাহাও সে বুঝিল—তথাপি সে এ জলস্রোতকে বাধা দিতে পারিল না।

সে যে নিরপরাধ, বিপন্নকে উদ্ধার করিতে আসিয়া এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছে—একথা কেহই শুনিল না। কারণ একে সে অপরিচিত, তাহাতে ঘটনাস্থলে ধৃত;—অথচ এত রাত্রে সে যে এখানে কি করিয়া আসিল, ইহারও কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ সে দিতে পারে না।

নিঃসহায় রামচন্দ্র আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া—বিধিলিপিতেই অগত্যা নির্ভর করিয়া রহিতে চাহিল। কিন্তু তাহা পারে কৈ? তাহার সমস্ত চিত্ত শতমুখে নীরবে নিবেদন করিতেছে—'ওগো আমি যে নিরপরাধ! আমাকে বিশ্বাস কর'। সে যে নিরপরাধ, এই অবিশ্বাস্য কথাটিকে অবাধ অশ্রুজল ভিজাইয়া ভিজাইয়া কেবল ভারিই করিয়া তুলিল।

রামচন্দ্র শুনিল, রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে এজাহার দিল—সাত আটজন লোক এসেছিল;—এ ব্যক্তিও তাদের মধ্যে একজন।

রামুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডাকাতি হইয়াছে মাঝেরগ্রামে। এখান হইতে চন্দ্রপুর বারক্রোশ দক্ষিণে। চন্দ্রপুরে রামুর বাড়ী। বাড়ীতে তাহার স্ত্রী ও একটি চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক পুত্র—কিশোর। এই দুইটি প্রাণী লইয়াই রামুর সংসার।

রামু লোকটার স্বভাব ছিল খুব অদ্ভুত। মুখটা বড়ই আল্গা ও কর্কশ; সামান্য কারণেই সে চটিয়া উঠিত; কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই কহিত না; নিজেও কাহারও গৃহে যেমন বিনা কারণে যাইত না, তেমনই নিজগৃহেও কাহাকে সে অকারণ ডাকিত না। রামু এদিকে স্বল্পভাষী, কিন্তু 'কুকথায় পঞ্চমুখ'কেও হার মানাইয়া দিত।

এককালে রামুর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তাহার উঠানে, খামারবাড়ীতে কিছু কম হইলেও বিশত্রিশটা গোলা ও মরাই থাকিত; পনর-খানা লাঙ্গলের চাষ ছিল—কত লোক তার চাকরী করিত। আজ তার "তেহি নো দিবসা গতাঃ।" জমিদারের সঙ্গে এক মাম্‌লা বাধাইয়া তুলিয়া—মারপিট করিয়া—শেষে পণ করিয়া বসিল, খড়কেগাছি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও সে মকদ্দমা চালাইবে। ঘটিলও তাই। দুইতিন বৎসরে মকদ্দমা যখন মিটিল—তখন রামুর

হুঁস্ হইল ; দেখিল তাহার আর কিছুই নাই। বিচারালয়ের পাণ্ডাদের অবশিষ্ট-প্রসাদ যেটুকু আছে, তাহাতে কোনও মতে কষ্টেস্বষ্টে তাহার দুইবেলা দুইমুষ্টি অন্ন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু রামু তাহাতে দুঃখিত বা চিন্তিত হইয়াছিল বলিয়া ত বোধ হয় না—কারণ সে বুক ঠুকিয়া একটু হাসিয়া বলিত—"মকদ্দমা ত জিতেছি!" এ দশ বৎসর আগেকার ঘটনা।

জমিদারকে যে চাষা মকদ্দমায় হারাইতে পারে, গ্রামে যে তাহার কি প্রতিপত্তি হয়, তাহা বলা শক্ত ; অর্থাৎ যদি কখনও বঙ্গীয় চষ্য-বংশ তাহাদের স্বজাতির ইতিহাস রচনা করে, তাহা হইলে রামচন্দ্রকে যে তাহারা গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি বীরবর্গের সহিত এক-আসন দিবেন—একথা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি।

উক্ত কারণে এবং তাহার খামখেয়ালী-মেজাজের দরুণ গ্রামের সকলেই রামুকে একটু ভয় করিত। কাযেই রামচন্দ্র মণ্ডলের প্রতিপত্তিও ছিল অপ্রতিহত।

রামুর অবস্থা যখন বেশ চল্‌তি ছিল, তখন সে লোককে বিনা-স্নদে টাকা দিত ; তখন দিন গেলে কোন্ না দশবিশখানা পাতাও পড়িত ; তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণবাড়ীতে সিধা, ঠাকুরবাড়ীতে ভোগ, কালীবাড়ীতে পূজা, এ ত প্রায়ই সে পাঠাইত। আর তখন মেজাজটাও এত খারাপ ছিল না। মুখেও হাসি ছিল। আজকাল রামু বাড়ীতেও খুব অল্প কথা

কয় ; অবসর পাইলেই সে খামারবাড়ীর চালায় তালপাতার বুনানি একখানি চাটাইয়ে বসিয়া তামাক খায়। মুখখানা চব্বিশঘণ্টাই গম্ভীর। মুখ ফুটিয়া সে রাস্তার লোককে একবারও বলে না—"ওগো, একবার এসে এই তৈরি তামাকটা খেয়ে যাও।" যদি কোনও ভিন্ গাঁয়ের পথিক কখনও স্বেচ্ছায় তাহার নিকট তামাক খাইতে আসিত, তাহা হইলে সে তাহাকে একটু মিষ্টমুখ না করাইয়াও ছাড়িত না। তাহার অনুরোধে এমনি একটা আদেশ থাকিত যে, যে আসিত, তাহাকে ভরাপেটে মুখের পান ফেলিয়াও একখানা বাতাসা ও একটু জল খাইতেই হইত।

গ্রামের বয়স্ক-লোকে রামুকে যেমন ভয় করিত এবং তাহার প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব পোষণ করিত, ছোট ছোট ছেলেরা তেমনই তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত। পাঁচ ছয় সাত আট দশ বৎসরবয়স্ক ছেলেমেয়েরা মোড়ল-মহাশয়কে দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। সারাদিনই অন্তত দু'টি তিনটি ছেলে রামুর সহচর থাকিতই। মাসের অর্দ্ধেক দিন তাহাদের মোড়ল-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইত—পূজা-পার্ব্বণে কোন সামগ্রী বা দুই-একটা পয়সা তাহারা সকলেই পাইত। ইহাদের সঙ্গে রামু হাসিত, খেলিত, এবং সময়ে সময়ে কোনও বালকের অদ্ভুত আব্দার পূর্ণ করিতে কচি পেয়ারাটি পাড়িয়া দিবার জন্য গাছে পর্য্যন্ত উঠিত।

সংসারে এত টানাটানি, অথচ পাঁচপরের ছেলেদিগের

জন্য অর্থের অপব্যয়হেতু মোড়ল-গৃহিণী যদি কখনও তাহার স্বামীকে কিছু বলিত—ত' রামু বিরক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চুপ করিয়া কেবল শুনিয়া যাইত; বিরক্ত হইলে মুখ খিঁচাইয়া পত্নীকে বুঝাইয়া দিত যে, রামু তাহার শ্বশুরের পয়সা খরচ করিতেছে না।

সময় যখন যাহার মন্দ পড়ে, তখন সে ভাল করিলেও ভাল হয় না। রামুকে যে সব ছেলেরা ভালবাসিত, রামুর কাছে যাওয়া আসা করিত—তাহাতে তাহাদের পিতামাতা অভিভাবকগণ তাহাদিগকে এজন্য নানারূপে নিগৃহীত করিত। রামুর উদ্দেশেও বলিত—"হতভাগা বুড়ো ড্যাক্‌রা, সব্বারই সর্ব্বনাশ কর্‌বে—আবার ছেলে-ভুলিয়ে সাধু সাজতে যায়?"

বছরদুই আগে যে মদনা গোয়ালার সঙ্গে বচসাসূত্রে তাহার এক-ক্ষেত কলাই রামু নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার গরু দিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিল—এবার বর্ষায় তাহার কুঁড়ে-ঘরখানি পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া রামু যে নিজব্যয়ে সেখানি উঠাইয়া দিয়াছে, ইহাতেও লোকে রামুকে গালি না দিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল—"ঘাটে-পড়া বুড়োর ঠাট্ দেখে বাঁচি না। ম'লে যে গাঁয়ের আপদ যায়!"

লোকের মুখে কি হাত দেওয়া যায়? লোকে যাহাই বলুক না কেন, ইতিহাস কিন্তু শ্রীমান্ রামচন্দ্র মণ্ডলকে সপ্তত্রিংশৎ বর্ষের অধিক পুরাতন বলিয়া স্বীকার করেন

না। তবে অল্পবয়সেই তাহার মাথায় বৃদ্ধত্বের ছাপটা পড়িয়া গিয়াছিল, এই যা'।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামু গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার নাম করিয়া মাঝেরগাঁয়ে গিয়া ডাকাতি করিয়াছে, খুন করিয়াছে, এ খবর দেখিতে দেখিতে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমটা সকলেই বজ্রা-হতের মত স্তম্ভিত হইয়া গেল;—ক্রমে ক্রমে সকলের মুখেই একটা হিংসকের বিজয়-তৃপ্তির আনন্দজ্যোতিঃ ফুটিতে লাগিল। রামুর দ্বারা যে এ প্রকার কার্য্য হইতে পারে, ইহা সকলেই বিশ্বাস করিল;—যে দুই চারিজন অবিশ্বাস করিয়াছিল. তাহারাও মুখ-ফুটিয়া সাধারণের ঈদৃশ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না।

রামুব গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহার পত্নী বুক চাপড়াইয়া, মাথা খুঁড়িয়া রক্তারক্তি করিয়া ফেলিল। চন্দ্রপুর গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নয়—কিন্তু মোড়ল-পরিবারের এমন বিপদের দিনে আন্তরিক সহানুভূতি কেহই দেখাইল না। অনেকেই আসিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই সান্ত্বনার বদলে গায়ের ঝালই ঝাড়িয়া গেল; বহুদিনের চাপা-কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া বাঁচিল। "রামুর ফাঁসি এবার নিশ্চিত" "এত অত্যাচার কি সয়?" "পাপের কি সাজা নেই?" "ধর্ম্ম যদি না থাকবে ত সংসারটা চলচে

কি করে ?” প্রভৃতি শ্লেষে, ব্যঙ্গে টিটকারি-রঙ্গে এই নিরুপায়, আর্ত্ত, বিপন্ন মাতাপুত্র শোকের অপেক্ষা শঙ্কাতেই অধিক কাতর হইয়া পড়িল।

ঘটনার পর তৃতীয়দিন দ্বিপ্রহরে জেলা হইতে সদল-বলে পুলিশ-সাহেব চন্দ্রপুরে তদন্তে আসিলেন। রামুর গৃহে খানাতল্লাসী হইল। কতকগুলি উলুখড়কাটা দা’, পাঁটাকাটা খাঁড়া, মাটিখোঁড়ার শাবল প্রভৃতি ডাকাতির সহায়ক অস্ত্র সন্দেহ করিয়া তাঁহারা লইয়া গেলেন—আর এমন করিয়া বাড়ীখানি এলোমেলো করিয়া দিয়া গেলেন যে, ডাকাতেরাও সেরূপ করে না। রামুর পত্নী ও পুত্র কনেষ্ট-বল হইতে পুলিশ-সাহেবের পর্য্যন্ত পদলুণ্ঠিত হইয়া কত কাঁদিল, কত কাকুতি-মিনতি করিল—কিন্তু কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। কেবল নূতন পুলিশ সাহেবই একবার কহিলেন—“হামি কি করবে মাঈ, হামি সরকারী নোকর। মাট্ রোও টুম্—আডালটমে যো হোগা---ওই হোবে। আবি মাট্ ডরো।”

গ্রামের সাতকড়ি বিশ্বাস, তিনু চৌধুরী, হরিশ মোড়ল, শিবু রাজবংশী, রাজকৃষ্ণ ভট্‌চাজ, যোগিন্ চাটুয্যে, যদু সা প্রভৃতি মাথালো-মাতব্বর ব্যক্তিগণ পুলিশ-সাহেবের নিকট তাঁহাদের নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া আসিলেন। কে যে কি বলিবেন, তাহা ত’ পূর্ব্বেই গ্রামের অশ্বত্থতলায় ঠিক হইয়াই ছিল—সুতরাং সকলেই যে এ বিষয়ে একমত

তাহা আমরা পুলিশের গোপনীয়-রিপোর্ট না দেখিয়াও জানিতে পারিয়াছি।

আদালতে মকদ্দমা আরম্ভ হইল। রামু পুলিশের নিকট যে এজাহার দিয়াছিল, আদালতেও তাহাই বলিল, একটি কথারও এদিক-ওদিক করিল না। তাহার সঙ্গে আর কে কে ছিল, প্রভৃতি প্রশ্নে সে বরাবর এক উত্তরই দিয়া আসিতেছে যে সে—নিরপরাধ ; সে এ ডাকাতি ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

রামুর গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত বড় বড় চক্ষু দুটিতে দৃষ্টি স্থির ; বলিষ্ঠ দেহখানি অটল এবং নির্ভীক ; মুখশ্রীতে একটা সুগভীর ব্যথা ও বিষণ্ণতার ছায়া সর্ব্বদা মুখটিকে যেন আশঙ্কিত ও মলিন করিয়া রাখিয়াছিল। মাথা নত করিয়া সে প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া কাঠগড়ার ভিতর প্রবেশ করে—আবার দিনান্তে তেমনি নিরুপায় শ্লথ-গতিতে কারাগারে প্রবেশ করে।

পক্ষসমর্থনের জন্য রামু কাহাকেও অনুরোধ করিল না, কিন্তু সে দেখিল দুইজন বিখ্যাত উকীল বিনা-অনুরোধেই রামুর কার্য্য করিতে লাগিলেন। রামু শুধু তাহাতে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মকদ্দমা দায়রা-সোপর্দ্দ হইল। জজসাহেব দয়াপরবশ হইয়া ফাঁসি না দিয়া দশবৎসর দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা দিলেন। দণ্ড শুনিবামাত্র রামু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সেইদিন রামু তাহার উকীল দুটিকে ডাকিয়া কাছে আনিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছিল—এবং কি বলিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও বলিতে না পারিয়া কাঁদিয়া মাটি ভিজাইয়া ফেলিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দণ্ডাজ্ঞা দিয়া জজ-সাহেব স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রামুকে কিছুক্ষণের ছুটি দিলেন।

রামু গম্ভীরভাবে পুত্র কিশোরকে বলিল—"বাবা কিশুরি, কারু সঙ্গে কোন রকম গোলমাল যেন ক'রো না। ভগবান্ যা' করেন ভালর জন্যই। এই সাজা আমার পূর্ব্ব-জন্মের পাওনা ছিল—তাই হয়ে গেল। এর জন্য দুঃখ ক'রো না।"

রামুর কণ্ঠস্বর সতেজ, চক্ষু শুষ্ক।

কিশোর কাঁদিয়াই আকুল, সে বলিবে কি? বলিল—"যারা তোমার নামে মিথ্যে—"

রামু বাধা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"খবরদার!"

স্ত্রী কাঁদিতেছিল। এই তিন মাসে সে এমন কাহিল ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে আর চেনাই যায় না।

রামু স্ত্রীকে বলিল—"সংসার বরাবরই যেমন চল্‌তেছে—তেম্‌নি করেই চালিও। আমার জন্যে কোনও চিন্তা ক'রো না। দশটা বছর তো, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে যাবে।

আমার অদৃষ্টে যা' ছিল তা খণ্ডাবে কে? এতে কারুরই দোষ নেই।"

ঝম্‌ঝম্ করিয়া লৌহ-শৃঙ্খল বাজাইতে বাজাইতে রামচন্দ্র কারাগৃহাভিমুখে রওনা হইল; সে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

রামু যে সত্যসত্যই খুনে-ডাকাত, আজ তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

রাত্রে নির্জ্জন অবরোধ-কক্ষে বসিয়া নিদ্রাহীন রামু ভাবিতেছিল—"নিশ্চয়ই আমি খুন করেছি। আমি ডাকাতি কর্‌তেই গিয়াছিলাম। হয়ত আমার মনে নাই, কিম্বা বরাবর ভয়ে আমি মিথ্যে কথাই বলে' এসেছি।" রামু যে নিরপরাধ, এখন আর সেকথা সে নিজেই ভাবিতে পারিল না।

এক একবার স্ত্রী, পুত্র, ঘরসংসারের কথা মনে পড়ে ত, রামু তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া সে চিন্তাকে অপসৃত করিতে চাহে—কিন্তু সরানো জলের মত আবার তাহারা তখনই আসিয়া জমিতে লাগিল। এই কারা-কক্ষখানিকে সে যে চিন্তাশূন্য করিতে চায়—কারণ এখানে এখন তাহাকে বাধ্য হইয়াই যে থাকিতে হইবে!

পত্নীর অশ্রুসিক্ত, বেদনাতুর, ভরসাহীন দৃষ্টি, পুত্রের হতাশালিপ্ত ব্যথাঙ্কিত রোরুদ্যমান বদন-মণ্ডল, পাড়ার ছেলেগুলির সেই সুমধুর আদর আপ্যায়ন—বায়োস্কোপের

ছবির মত, বাস্তব অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে একে একে রামুর মানসপটে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। সংসারের কাযকর্ম্ম, আয়ব্যয় প্রভৃতিও সে আলোচনা করিল। একটি চৌদ্দ-বৎসরের বালকের উপর সংসার! গ্রাম শত্রুপূর্ণ! বুঝি এই দুটি নিরবলম্বন নিরুপায় মাতাপুত্র লোকের উৎপীড়নেই মরিয়া যাইবে। দরদরধারে রামুর শীর্ণ-কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পাষাণপুরীর পাষাণকুট্টিমে টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

নিদারুণ নিরাশা ও শোক রামুকে এমনই বিদ্ধ করিতে লাগিল যে, সে কখনও যাহা কামনা করে নাই, সেই মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা চাহিল। চিন্তার এক ধারাকে নেপথ্যে সরাইয়া, রামু আজ হইতে দশবৎসর পরের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু তাহা আশু-বেদনা-কাতর হৃদয়ের উপর কোনও মতেই ফুটিল না—একটি ক্ষীণ-রেখাপাত পর্য্যন্ত করিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম মাস চারপাঁচ কিশোরদের খুব কষ্টেই কাটিল। সাংসারিক কষ্ট অপেক্ষা লোকের ঠাট্টাবিদ্রূপেই ইহারা সর্ব্বাধিক দুঃখ পাইতেছিল। গ্রামের জমিদার হইতে নিম্নতম হাড়ি ডোম অবধি সকলেই আপন আপন সাধ্যমত কিশোরদের শত্রুতা-সাধনে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা রামুর

নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত, তাহারাই রামুহীন এই নিরাশ্রয় পরিবারের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীর পিছনে কিশোরদের একটা বাগান ছিল—সকালে দেখা গেল ভাল ভাল কলমের আমের চারাগুলিকে কে কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। বেড়ের বাগানে ফলমূল যাহা ফলে, সন্ধ্যায় বেশ থাকে, কিন্তু সকালবেলায় আর তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। বাড়ীর পাশে একটা গর্ত্তে বর্ষার জল জমিত; সেটাতে কিশোরদের কিছু মাছ ছাড়া ছিল;—সেদিন কি প্রয়োজনে কিশোর জাল নামাইল; উঠিল কেবল শামুক, গুগ্‌লি ও পানা। এইরূপে লোকে কারণ অকারণে তাহাদিগকে বড় উত্যক্ত করিয়া তুলিল।

উৎপীড়নে সুখ হয়, যদি উৎপীড়িত উৎপীড়ককে বাধা দেয় বা উৎপীড়িত ব্যক্তি কাতর হইয়া প্রকাশ্যে উৎপীড়ন স্বীকার করে। কিশোর পিতৃ-আজ্ঞায় কাহাকেও কোন বাধা দিল না; যাহার যেমন ইচ্ছা, সে সেইরূপ ভাবেই কিশোরদের জীবিকা-নির্ব্বাহের পথে কণ্টক বিছাইল। কিন্তু যাহার জন্য এত করা, সে যখন তাহাতে ভ্রুক্ষেপই করিল না, হাসিমুখে অক্ষত-চরণে চলিয়া গেল, তখন লোকে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

আগুন জ্বলিতে জ্বলিতে ছাই হয়, আর বাতাস বহিতে বহিতে সুরভিময় হয়। গ্রামবাসীদের উত্তেজনাও ক্রমশঃ ভস্মে পরিণত হইল। কিশোর ও তাহার জননী ক্রমাগত

অত্যাচারের ঘাত-প্রতিঘাতে গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। তাহারা সকলের উৎপীড়নের পাত্র হইয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্যে গর্ব্বিত হইয়া যেন গ্রামবাসীকে নীরব-উপহাসে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

শ্রাবণ মাস। বিগত পাঁচদিন পাঁচরাত্রি ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতেছে! গ্রামপথে হাঁটুভোর জল। যত খাল-ডোবা ছিল, সব জলে কানায়-কানায় ভরা; ছাগল গরুও আজ পাঁচদিন যাবৎ গোয়ালে আবদ্ধ।

বেলা প্রায় দশটা। কিশোর একটা "মাথালি" মাথায় দিয়া গোয়াল পরিষ্কার করিতেছে, এমন সময় কে ডাকিল —"কিশোর, কিশোর বাড়ীতে আছ?"

তাড়াতাড়ি ছাঁচ্‌তলার জলে হাত দুখানি আধ-ধোয়া করিয়া শশব্যস্তে কিশোর বাহিরে আসিল। দেখিল—এক অপরিচিত ব্যক্তি। তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ; বেশ সুস্থ, সবল, দৃঢ় পেশীযুক্ত শরীর, দেহের বর্ণ শ্যাম, দাড়ি-গোঁফ্ কামান—হাতে চীনাবাজারের একটা ক্যান্‌ভাস্ ব্যাগ—ব্যাগের উদরটি পরিপূর্ণ।

কিশোর এই নবাগতের দিকে সসম্ভ্রমে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে ডাক্‌চেন? আমি ত'—"

আগন্তুক কহিল—"বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি আমায় চিন্‌তে পার নাই, তা কি করে পারবে বল, আমিই কি চিন্‌তে পারি এখন? তোমার বয়স যখন চার পাঁচ বছর, তখন

কেবল একবারটিমাত্র আমি তোমায় দেখেছিলাম। আমি এখন রাজনগরে থাকি—আর বহরমপুরে এক সাহেবের কায করি। ছুটিও পাই না; তা ছাড়া নানান্ ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকি; ইচ্ছে কর্‌লেও ত আস্‌তে পারি না। আহা, আপনার লোক; হাজার হোক্। দেখ্‌লেও আনন্দ হয়।"

কিশোর চতুর্দ্দশবৎসরের কিশোর বালক হইলেও বিগত ছয়মাসের উৎপীড়নে সে স্বাবলম্বন এবং আত্মরক্ষায় এত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে যে, সে মধুর কৈশোরের নম্মলীলা এবং অপরিমিত বিশ্বাস-প্রবণতার সীমা পার হইয়া একেবারে প্রৌঢ়ের মত সন্দেহপূর্ণ এবং বিচারক্ষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই অকস্মাৎ অপরিচিতের এই স্নেহের আহ্বানকেও সে দুষ্টলোকের চক্রান্ত না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে, অসঙ্কুচিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার নাম?"

আগন্তুক কহিল—"আমার নাম বদ্দিনাথ মণ্ডল। তোমার বাপের অর্থাৎ রামচন্দ্রের আমি সাক্ষাৎ খুড়্‌তুতো দাদা। আমি এখন রাজনগরে থাকি।"

উক্তগ্রামে তাহার একজন অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যেষ্ঠতাত আছে, কিশোর ইহা জানিত। সে নতজানু হইয়া প্রণাম করিল।

বৈদ্যনাথ "বেঁচে থাক" বলিয়া তাহার মস্তকস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল; বলিল—"তোমাদের এখন ভারি বিপদ! তাই এ দুঃসময়ে একবার খোঁজ না নিয়ে থাকতে

পার্লাম না। এতদিন অবিশ্যি রামু ছিল—আমার খোঁজখবর করার দরকারও তেমন ছিল না। আহা—” বলিতে বলিতে বৈদ্যনাথের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া সমস্ত সহানুভূতি তরল মূর্ত্তিতে অশ্রুরূপে গড়াইয়া পড়িল।

কিশোরের জননী বৈদ্যনাথকে চিনিতে পারিলেন না—তবুও এই দুর্দ্দশায়, নিঃসম্বল বৈরিবেষ্টনের মধ্যে যে ব্যক্তি উপযাচক হইয়া শুধু একটু চক্ষের জল ফেলিয়া যায়, সে যে আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয়! তাই নিতান্ত নির্ভরে তিনি ভাবিলেন—“হ’তে পারে, মস্ত গুষ্ঠি, কে কোথায় আছে, তা কি আমিই সব জানি?” এই দুর্দ্দিনে দরদী কুটুম্ব লাভে মাতা পুত্র উভয়েই খুব আশ্বস্ত হইল।

বৈদ্যনাথ হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিল। বৈঠকখানার দাওয়ায় কিশোর একখানি বড় পিঁড়ি পাতিয়া একবাটি মুড়ি ও একখানা পিতলের চিত্রিত রেকাবীতে একধারে কিছু মুড়্‌কি ও খানদুই গুড়ের বড় বাতাসা দিয়া জলখাবার আনিয়া দিল। তাহার পর যাহা জুটিল, তাহাই আহার করিয়া বৈদ্যনাথ বিশ্রাম করিল।

বৈকালে বৈদ্যনাথ বিদায় চাহিল, তখন বৃষ্টিটাও একটু ধরিয়াছিল; কিন্তু আকাশের রং তখনও বহুদিনের পুরাতন তুলার মত পাংশুটে। স্তরে স্তরে মেঘগুলি চারিদিক হইতে আসিয়া মাথার উপর জমাট বাঁধিতেছিল; মাঝে মাঝে শ্রান্ত অশনি গুরুগুরু রবে আলস্য ভাঙ্গিতেছিল।

কিশোর বলিল—"আজকে না গেলে হ'ত না? জল ত এখুনি এল বলে'? পথে কষ্ট হবে রাত্তিরে।"

বৈদ্যনাথ বলিল—"থাক্‌বার যো নেই বাবা—তা'লে চাক্‌রী যাবে।"

বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুড়িটি টাকা দিয়া বলিয়া গেল, আপাতত এতেই যেন সে সংসার চালায়—সে মধ্যে মধ্যে আসিবে এবং তত্ত্বতালাস করিবে এবং মাসে মাসে, যত দিন না রামু ফিরে, পনরটি করিয়া টাকা দিয়া সাহায্য করিবে।

কিশোরের মাতার মনে এই আগন্তুকের সম্বন্ধের সত্যতায় প্রথমে যে একটু সন্দেহ হইয়াছিল—এখন সেটা বেশ নিঃশেষে কাটিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈদ্যনাথ তাহার প্রতিশ্রুতিমত গত আটবৎসরকাল কিশোরদিগকে মাসিক পনর টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছে। সে মাসে মাসে একবার আসে এবং টাকা কয়টি দিয়া সংসারের সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিয়া আবার সেই-দিনই অপরাহ্ণে চলিয়া যায়।

মাঘ মাস। কয়দিন হইতে শীতটা খুব জোরে পড়িয়াছে। উতলা বাতাসের একদণ্ডও বিশ্রাম ছিল না। বৈঠকখানা-ঘরের তক্তাপোষের উপর একটি বিছানায়

মধ্যাহ্নভোজনের পর বৈদ্যনাথ শয়িত—পদতলে কিশোর জ্যেষ্ঠতাতের পদসেবা করিতে করিতে নানারকম গল্প করিতেছিল। বৈদ্যনাথ মাঝে মাঝে কেবল হুঁ দিয়াই সারিতেছিল।

খানিকক্ষণ পরেই বৈদ্যনাথের নাসিকা-নিনাদে বুঝা গেল যে, তিনি নিদ্রার রথে আরোহণ করিয়াছেন—রথচক্র ঘর্ঘর শব্দে স্বপ্নলোকের পথে ছুটিয়াছে। কিশোরও জেঠার লেপটা একটু টানিয়া লইয়া সেইখানেই একটু গড়াইতে গিয়া তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে একটা উচ্চ রোদনধ্বনি ও কোলাহলে কিশোরের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া কিয়ৎক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিল; ক্রমে ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে আসিল; দেখিল উঠানে একজন লোক। তাহার চুল দাড়ি খুব বড় বড় —পাকিয়া একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। এই আগন্তুকের মুখ দেখিবামাত্র কিশোরের হৃদয়-তন্ত্রীতে একটা আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ বলিল—"আর কেঁদে কি হবে? কান্নার ত শেষ হল।"

এখন কিশোর বুঝিতে পারিল যে, এ তাঁহার নির্ব্বাসিত পিতা—ফিরিয়া আসিয়াছে। সে একেবারে শিশুর মত চঞ্চল হইয়া, আগ্রহে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পিতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

রামু সস্নেহে পুত্রকে উঠাইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। তপ্ত-অশ্রুর অজস্র অভিষেকে পিতাপুত্রে মিলন হইল।

গ্রামে বিদ্যুতের মত রাষ্ট্র হইয়া গেল—রামচন্দ্র মণ্ডল আবার দেশে ফিরিয়াছে। প্রথমটা যে শুনিল, সেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। যাহারা পূর্ব্ব-শত্রুতা স্মরণে গৃহপ্রবেশে অনিচ্ছুক, এবং যাহারা অন্য কোনও কারণে তাহার সম্মুখে আসিতে পারিতেছিল না—তাহাদের আগমনে রামুর বাড়ির সম্মুখের পথ হঠাৎ ভরিয়া গেল। সকলেরই সমুৎসুক দৃষ্টি আজ রামুর গৃহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

হঠাৎ এই দরদীদের বাহুল্যে কিশোর ও তাহার জননীও যেমন মনে মনে হাসিতেছিল, রামুও তেমনি যে একটু বিরক্ত না হইতেছিল, তাহা নহে। লোকের ভীড় কমিলে, রামু কি করিয়া এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, সকলকে বলিল। তাহার কারাবাস ও পুলি-পোলাও-বাসেরও একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিল। আর সে উর্দ্ধকরে প্রণাম করিল সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকে—কেন না তাঁহারই ভারতে আগমন উপ-লক্ষ্যে সে এই দুইবৎসর পূর্ব্বেই ছাড়া পাইয়াছে।

একে ত' শীতের দিন দেখিতে দেখিতেই কাটিয়া যায়; তাহাতে আবার সেদিন মেঘ করিয়াছিল, সুতরাং মেঘে ও সন্ধ্যায় ক্ষুদ্র-প্রাণ, ক্ষণিকশ্রী অপরাহ্নকে টিপিয়াই মারিয়া ফেলিল। চৌদিকে মশক-সংঘ তিমির-সন্ধ্যার বন্দনারতি

গাহিয়া উঠিল। রামু, কিশোর ও বৈদ্যনাথ তিনজনে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালাইয়া গল্প করিতেছিল।

কিশোর বলিতেছিল যে, তাহার জ্যেষ্ঠতাত এই বৈদ্য-নাথ মণ্ডলই প্রকৃতপক্ষে বিগত আট বৎসর অত্যাচরিত, নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় সংসারটিকে রক্ষা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ-তাতের সাহায্যের অর্থ হইতেই কিছু কিছু বাঁচাইয়া সে এখন দুইজোড়া বলদ কিনিয়াছে, জমিজমাও কিছু বাড়াইয়াছে, ঘরে চাষ সুরু করিয়াছে, গর্ত্তটার মাটি তোলাইয়া পুকুরের মত করিয়াছে, এবার আবার তাহাতে কিছু ভাল পোনাও ছাড়িয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রামু বৈদ্যনাথকে চিনিতে না পারিলেও অসীম কৃত-জ্ঞতায় এই পরিচয়হীন আত্মীয়টির প্রতি সমস্ত মনেপ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। বিপুল ভাবাবেশে সে বৈদ্য-নাথের মুখপানে চাহিতে পারিতেছিল না।

রামু বলিল—"আমার যে এমন দাদা ছিলেন, তা' যদি আমি জান্‌তাম—তাহ'লে কি কিছু কষ্ট হত? আমি নিজের দুঃখে একদিনও কাতর হই নাই, কেবল তোমাদের যে কি ভাবে রেখে গেছি, এই চিন্তাই আমায় পাগল করে তুল্‌ত। তোমাদের এমন অবস্থায় দেখ্‌ব জান্‌লে আমার যে অপরাধ নেই, এই কথাটা আমি যেমন বুক-জুড়ে বসিয়ে-ছিলাম—তেমনই এই দুঃখকেও সরিয়ে ফেলে আমি দিন কাটাতে পারতাম।"

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। এ মৌন, কথার সমাপ্তিতে নয়, পর্য্যাপ্তিতে। কথা যখন আকণ্ঠ, কণ্ঠ তখন আপনিই রুদ্ধ হইয়া যায়।

রামুই পুনরায় কথা আরম্ভ করিল। হাত কচলাইতে কচলাইতে, ভূমিসমস্ত-দৃষ্টিতে, প্রাছে বেদনা দেওয়া হয়, এইরূপ শঙ্কা ও সঙ্কোচের সুরে রামু বলিল—"দাদা, কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

বৈদ্যনাথ স্বাভাবিক অচঞ্চল সুরে বলিল—"কি বলছ ভাই ?"

"আপনাকে আমি ঠিক চিন্‌তে পারছি নে। হরি কাকার এক ছেলে—তার নাম ত শরৎ। সে জন্মাবধি তার মামারবাড়ী রাজনগরেই থাকে জানি। তার পরে, তাকেও আমি কতবার দেখেছি—তাছাড়া সে ত চাস-বাস করে, কোনও সাহেব-টাহেবের চাকরী ত সে করে না।"

বৈদ্যনাথ প্রথমটা একটু হাসিল। সেই ক্ষীণালোকেই দেখা গেল যে, তাহার মুখমণ্ডলে লজ্জার একটা রক্তিম-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একটু হাসিয়া, একটু কাসিয়া, বৈদ্যনাথ গলাটা ঝাড়িয়া লইল। রামু উত্তরের প্রতীক্ষায় বৈদ্যনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিশোর একটু নড়িয়া-চড়িয়া নিকটে সরিয়া বসিল।

বৈদ্যনাথ ধীরে ধীরে বলিল—“চিন্‌তে না পারবারই কথা বটে! আমিই কি তোমায় চিন্‌তাম? সন্ধান করে’ নিলাম। তুমি এই খুন-ডাকাতিতে যখন গ্রেপ্তার হলে শুন্‌লাম—তখন প্রথমটা মনে বেশ স্ফূর্ত্তি হলো। ভাবলাম ‘যা শত্রু পরে পরে’, ভালই হলো। কিন্তু দু’এক দিন যেতে না যেতেই আমার মনটা যেন কেমন করতে লাগল। এমন আমার আর কখনও হয় নাই।

“হাঁ, আমার নাম মোটেই বৈদ্যনাথ নয়—আমার নাম বিশ্বেশ্বর। মাঝেরগাঁয়ের ও কাণ্ডটা আমিই করেছিলাম। যতই প্রমাণ হোক—যে যাই বলুক, আমি ত জানি যে, তোমার কোন দোষ নেই।

“হঠাৎ আমার তাই মনে হল যে, দোষ কর্‌লাম আমি, আর সাজা পাবে, যে একেবারে কিছুই জানে না। এই কথাটা আমার পাঁজরার মধ্যে এমন করে বিঁধে গেল যে, আমার আর কোন কিছু ভাল লাগ্‌ল না। ভাবলাম, নিজেই গিয়ে ধরা দিই এবং সমস্ত কথা খুলে বলে’ তোমায় ছাড়িয়ে আনি। কিন্তু সেটা সাহসে কুলোলো’না; কারণ পনরকুড়ি বৎসরকাল এই সব কর্‌তে কর্‌তে ভেতরটা যেন কি রকম হয়ে গেছে।

“হাঁ, যা বল্‌ছিলাম। নিজেকে ধরিয়ে দিতে যখন সাহস হলো না—তখন তোমাকে যাতে রক্ষা কর্‌তে পারি, এই হলো আমার প্রধান ভাবনা। রেতে ঘুম নেই; যদি

একটু চোখটা এঁটে আসে, অমনি ভয় দেখে জেগে উঠি; পেটে ক্ষিদে থাকে, গলা দিয়ে ভাত নামে না; কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেও ভাল লাগে না; আবার একাও থাক্‌তে পারি না। এ কি ভয়ানক যন্ত্রণা বল দেখি! এর চেয়ে ধরা পড়া অনেক ভাল ছিল! সব চেয়ে সেইটেই ভাই বড় কষ্ট, যে কষ্টের কথা কাউকে প্রকাশ করে বল্‌বার যো নেই।

"তুষের আগুণ ভিতর ভিতর ধিকিধিকি জ্বলে—তাকে থাবড়ে নেবাতে গেলে সে যেমন ছড়িয়েই পড়ে—আমারও দশা ঠিক তাই দাঁড়িয়েছিল।

"জেলায় গেলাম। খুব বড় যে সব উকীল, তাদের দু'জনকে তোমার দিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চুপে চুপে মকদ্দমার-তদ্বির কর্‌তে থাক্‌লাম। তাতে যেন কতকটা আরাম পেলাম।

"কিন্তু তোমার অদৃষ্টে ভোগ আছে, কে খণ্ডাবে? রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না যখন, তখন ভাবলাম—তোমার শাস্তি আমার কেন হল না। আবার সেই ভাব জেগে উঠ্‌লো! সময় সময় ইচ্ছে হতো নিজের গলা নিজে টিপে মেরে ফেলি—কোনও রকমে মরে' এ যাতনার শেষ করি। কিন্তু আবার ভাবলাম ম'রে লাভ কি? বরং তোমার না-ফেরা পর্য্যন্ত তোমার সংসারের সেবা করে একটু প্রায়শ্চিত্ত করি।

"এখানে ফাঁকিটা খুব ভালই দিলাম, উপরে ত দেবার যো নেই ভাই—" বলিতে বলিতে সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্তম্ভিত-চেতনায়, নিরুদ্ধশ্বাসে পিতাপুত্রে দস্যুর এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, যে, কখন যে কেরোসিনের ডিবিটা নিবিয়া গিয়াছিল, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য হয় নাই।

অন্ধকারে মুখ দেখা গেল না। রামচন্দ্র গদ্‌গদ স্বরে ডাকিল—"দাদা, দাদা!

দূরে সরকারী রাস্তার উপর দিয়া কিনু পাগলা তখন গাহিয়া যাইতেছিল—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে—এ,
আমি আর বাইতি পারলাম না।"

কবির সুবুদ্ধি

"কাব্যং করোষি কিমু তে সুহৃদো ন সন্তি
যে ত্বামুদীর্ণপবনং ন নিবারয়ন্তি।
গব্য ঘৃতং পিব নিবাতগৃহং প্রবিশ্য
বাতাধিকা হি পুরুষাঃ কবয়ো ভবন্তি॥"—ইত্যুদ্ভটঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সরোজকান্ত বাল্যকাল হইতেই কবি। কাব্যচর্চ্চায় অত্যধিক মনোনিবেশ বশত প্রবেশিকা পরীক্ষাটি সে আর কিছুতেই পাশ করিতে পারিল না। কয়েকবার উপর্য্যুপরি ফেল হইয়া সে লেখাপড়া ছাড়িয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিল—ভাবিল এমনি করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিবে। ক্ষেতে ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, বাগানে তরিতরকারী ছিল, গোহালে দুধ ছিল, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের তাহার অভাব ছিল না। চাকুরী সে করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় উপর্য্যুপরি তাহার দুইটি কন্যাসন্তান জন্মিল। তখন জননীর অনুরোধে, পত্নীর অনুযোগে, জ্ঞাতি প্রতিবেশীর পরামর্শে, নিন্দুকের টিট্‌কারিতে এবং যুগলকন্যার চিৎকারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শেষে কবি অগত্যা চাকুরী করিতেই রাজী হইল।

শুভদিনে শুভক্ষণে সরোজ কলিকাতা আসিল। চাকরী অন্বেষণে তাহার তেমন কোনও ব্যগ্রতা কিন্তু দেখা গেল না; মেসের বাসায় বসিয়া বসিয়া সর্ব্বদা সে কবিতাই লিখিত। সকাল সন্ধ্যা সে কোন না কোন মাসিকসম্পাদকের গৃহে কিম্বা আফিসে বসিয়া আড্ডা জাঁকাইত। ক্বচিৎ কখনও খেয়াল হইলে কোনও আফিসে বেগারঠেলা গোছের এক আধবার যাইত; ঐ পর্য্যন্ত।

কলিকাতায় আসিবার বছর দেড়েক পূর্ব্ব হইতেই সরোজের কবিতা মাসিক পত্রাদিতে ছাপা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন "সুধা" "জননী" "শান্তি" প্রভৃতি মাসিকে তাহার কবিতা অজস্র ধারায় বাহির হইতে লাগিল।

যখনি সময় পাইত, কি নূতন কি পুরাতন মাসিকগুলি খুলিয়া, সরোজ আপন কবিতার নিম্নে ছাপার হরফে নিজের নাম দেখিতে দেখিতে আনন্দে গৌরবে আশায় একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত। যে যে সংখ্যায় সরোজের কবিতা আছে, সেই সেই সংখ্যা কাগজগুলি তাহার মেসের কক্ষে ছোট টেবিলটির উপরে অথবা বিছানার উপরে সর্ব্বদা এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিত যে, সে ঘরে কেহ প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার নজরে পড়ে।

মেসের লোককে কবিতা শুনাইয়া, মাসিকপত্রের আপিসে আপিসে আড্ডা দিয়া, সরোজ একটি বৎসর

কাটাইয়া দিল, অথচ আসল কাযের কিছুই করিতে পারিল না। তাহার জননী তখন তাহাকে একখানি কড়া করিয়া পত্র লিখিলেন যে, যদি চাকরী না মিলে তবে সে যেন বাড়ী ফিরিয়া আসে, কারণ তাঁহার এমন সঙ্গতি নাই, যাহা দ্বারা তিনি নিয়মিতভাবে পুত্রকে মাসিক পনেরটি করিয়া টাকা সাহায্য করিতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁহাকে নাকি কিছু ঋণগ্রহণ করিতে হইয়াছে ইত্যাদি। এ পত্রে যখন কোন ফল ফলিল না, তখন অগত্যা তাঁহাকে টাকা বন্ধ করিতেই হইল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই মাসিক পনের টাকা পারিশ্রমিকে একটি টিউশনি সরোজের জুটিয়া গেল। মায়ের গুণগ্রাহিতার অভাবে এবং এবম্বিধ মনীষী পুত্রকে হঠাৎ বিপন্ন করায় সরোজ খুবই চটিয়া গিয়া আর বাড়ীই গেল না। চাকরীর চেষ্টায় এইবার ভাল করিয়া লাগিতে হইল—এবং "অর্থ মনর্থং" অর্থের অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে একটি কবিতাও সে লিখিয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন সময়ে "মেঘমল্লার" নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র বাহির হইবে বলিয়া গুজব উঠিল। দেখিতে দেখিতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দৈনিক প্রভৃতি সমস্ত সংবাদপত্রে অজস্রধারে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে, ডবলক্রাউন

অষ্টাংশিত মাসিক দুইশত পৃষ্ঠায়, প্রতিমাসে সাতচল্লিশখানি রং-বেরংয়ের চিত্রে এবং বঙ্গের তাবৎ শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনায় পরিপূর্ণ হইয়া "মেঘমল্লার" প্রকাশিত হইবে। লোভনীয় ও মনভুলানো ভাষায়, আইন বাঁচাইয়া যত প্রকারের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা চলে, বিজ্ঞাপনে তাহার কোনও ত্রুটি হইল না। সে যাহাই হউক, বিজ্ঞাপনে লেখকগণের যে ফিরিস্তি ছাপা হইয়াছিল—তাহাতে এখন সরোজেরও নাম ছিল। যশের উন্মাদনায় সরোজ একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল।

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী কোম্পানির আফিসে ত্রিশ মুদ্রার একটি চাকরীর সম্ভাবনা সরোজের হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সপ্তাহকাল মধ্যে একবারও সেদিকে যাইবার একান্ত অবকাশাভাবে—সেটি ফস্কাইয়া গেল।

অষ্টম দিনে সরোজকান্ত তাহার মসীকৃষ্ণ অংসবিলম্বী কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ দোলাইয়া, বোতাম-খোলা সার্ট গায়ে দিয়া আফিসে হাজির হইয়া শুনিল যে, তাহার অদর্শন জন্য, সে পদ সাহেব জনৈক অকবিকে দান করিয়াছেন। সে তখন ম্লানমুখে বড়বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বড়বাবু লোকটি ভাল। তিনি সসংকোচে মৃদু একটু ভৎ র্সনা করিয়া স্নেহপরবশ হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, যা হবার তাতো হয়ে গেছে—তার তো আর উপায় নাই। দেখি দাঁড়াও। আর একটা চাকরি খালি ছিল—আমাদের

আফিসে নয়, অন্য আফিসে। কিন্তু সেটা এখনও খালি আছে কিনা জানি না। যাই হোক, আমি একখানা চিঠি দিচ্ছি। এখানা নিয়ে কাল বেলা দশটার সময় একবার ষ্টেড্ কোম্পানির আফিসে যেও। সেখানে সুরেনবাবু বড়বাবু, তাঁকে এই খানা দিও—যদি কাযটা খালি থাকে তো পাবে বোধ হয়।”

এই বলিয়া বড়বাবু সরোজের মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। সরোজ কৃতজ্ঞতাব আতিশয্যে উজ্জ্বল হাসিতে মুখমণ্ডল আরক্তিম করিয়া হাত কচ্লাইতে লাগিল। বড়বাবু পত্র লিখিতে লাগিলেন।

এই সময় সরোজ তাহার চতুঃপার্শ্বে একবার চাহিল। দেখিল—দূরে, অদূরে সারি সারি অগণিত যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ মাথা নত করিয়া কত কি লিখিতেছে। তাহাদের আশে পাশে কত কাগজ, কেতাব ও খাতা। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল—হায় রে কপাল, যে লেখনী কাব্যের পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বঙ্গদেশকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুরভিত করিয়া দিবে, আশা করিয়াছিলাম, সেই লেখনী এই সকল খাতাপত্রের মরুবক্ষে ক্ষয় করিতে হইবে!

চিঠি শেষ করিয়া বড়বাবু বলিলেন—“এই নাও, এই চিঠিখানা সুরেনবাবুকে দিও। (ঘড়ির পানে তাকাইয়া) আজ আর বোধ হয় হবে না—কাল বেলা দশটা এগারটার

মধ্যেই যেও যেন। কি হয় আমায় একটা সংবাদ দিও।” বলিয়া বড়বাবু সরোজের হাতে পত্রখানি দিলেন।

সরোজ কি বলিতে গেল—কিন্তু কণ্ঠের কাছে আসিয়া কথাগুলি সব ঘুরপাক খাইতে লাগিল, মুখ দিয়া বাহির হইল না। কৃতজ্ঞতার ভাষা অনুচ্চারিত রাখিয়াই একটি ঢোক গিলিয়া, পত্রখানি লইয়া সে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেসে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সে দিন আর কবি টিউশনি করিতে গেল না। আস্তে আস্তে বারান্দায় যেখানে মেসিক-বন্ধুবর্গ দিবাবসানে বিশ্রম্ভালাপ অর্থাৎ নিজ নিজ আফিসের ও সাহেবদের সমালোচনা করিতেছিলেন, সরোজ আসিয়া সেইখানে উপবেশন করিল।

বিষ্ণুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি কবিবর, আজ যে বড় বিমর্ষ? মনটা খারাপ, না নূতন কিছু লিখ্‌বে তাই ভাবচো?”

কবি আকাশপানে একবার উদাস চাহনি চাহিয়া ভাবুকের মত গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—“না কিছু ভাবি নাই, মনটাই তেমন ভাল নাই।”

দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করিলেন—“কেন? কেন? বাড়ীর সব খবর ভাল তো?”

অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন—"কারু ব্যারাম-স্যারাম হয় নাই তো ?"

সরোজ বলিল—"সে সব কিছু নয়। বাড়ীর সবাই ভাল আছে।"

শশধরবাবু মেসে একটু রসিক বলিয়া বিখ্যাত। তিনি কবিজায়ার বিরহই কবির হঠাৎ এই ভাব-পরিবর্ত্তনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া হো হো করিয়া নিজেই সর্ব্বাগ্রে হাসিয়া উঠিলেন।

সরোজ তখন, যাহা ব্যাপার বলিল।

এবার সমবেদনার পালা। "তাই ত" "তবে ?" "না হয়—" "মুকুন্দদেব আফিসে" প্রভৃতি অসম্পূর্ণ বাক্যদ্বারা সকলে আপন আপন দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

এটি "অফিসারস্ মেস্"। সুতরাং রাত্রি আটটা বাজিতে না বাজিতেই ভৃত্য রামচরণ হাঁক পাড়িল "বাবু রসুই তৈয়ারী।" অমনি সকলেই আপন আপন লেবু ঘৃত চিনি আচার লণ্ঠন গামছা প্রভৃতি মেস্-বহির্ভূত খাদ্য ও অখাদ্য দ্রব্যের সরঞ্জাম লইয়া নিম্নতলে সশব্দে সদলে অবতরণ করিয়া আসন লইলেন।

পরদিন যথাসময়ে সরোজ ষ্টেড্ কোম্পানির আফিসে গিয়া হাজিরা দিল।

চাপ্রাশিদিগের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সরোজ একেবারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বড়বাবুর সম্মুখে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

বাবুটির নাম সুরেন্দ্রনাথ দে, জাতিতে তিলি। অপরিচিতের নিকট হইতে প্রথমেই নমস্কার লাভ করিয়া এবং তৎসঙ্গে একখানি সুপারিসের পত্র পাইয়া তাঁহার মনটা অকস্মাৎ একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া নিতান্ত বড়বাবুর ধাঁচে মুরুব্বীয়ানার চা'লে তিনি সরোজকে অনেকক্ষণ ধাবং একটি বক্তৃতা দিলেন। সরোজ নিরুপায়, চাকুরীর উমেদার, সুতরাং শুনিতে বাধ্য—শুনিলও তাই।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি সরোজকে সম্মুখের খালি চেয়ারখানি দেখাইয়া বসিতে বলিয়া, গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনও দরখাস্ত-টরখাস্ত এনেছ?"

সরোজ অপ্রতিভ হইয়া কাতরস্বরে জানাইল—"আজ্ঞে না। তবে যদি অনুমতি করেন এবং কোনও আশা থাকে তো—এখানে বসেই লিখে দিতে পারি।"

বড়বাবু চশমা জোড়াটি নামাইয়া রাখিয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সম্মুখস্থ একসারি লিখননিরত কেরাণীবর্গের পানে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া বলিলেন—

"তুমি তো বাপু তবু এণ্ট্রান্স্ ফেল্ করেছ; আর ঐ যে সব গাধার দল—ফাষ্টবুকের এঁড়ে গরুর গল্প পর্য্যন্ত বিদ্যে, ওদিকে তবে ঢোকালাম কি করে? সবাই এসে আমাকেই ধরে' পড়ে। আরে এ কি আমার বাবার আফিস? তা' কিছুতেই কেউ শুন্‌বে না। সাহেব আমার কথাটথা একটু

আধটু শোনেন কি-না—ঐ হয়েছে আমার বিপদ। কি কুক্ষণেই বড়বাবু হয়েছিলাম।”

সরোজ নীরব অধোমুখে শুনিতেছিল।

বড়বাবু কিয়ৎক্ষণ উত্তরের প্রত্যাশায় সরোজের মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন; শেষে নিজেই আবার প্রশ্ন করিলেন—“তুমি হবিপদকে পাক্‌ড়ালে কোথা? সে বড় ভাল ছেলে।”

সরোজ বিনয়-সঙ্কুচিতস্বরে বলিল—“তাঁর আফিসেই। তিনি নিজে হতেই দয়া করে' আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন।”

বড়বাবু ঈষৎ বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—“দয়া করে' চিঠি দেওয়ার চেয়ে একটা চাক্‌রী দিলে যে বেশী দয়া করা হতো! আমার কাছে কেন তবে?”

হঠাৎ সরোজের মাথা খুলিয়া গেল। সে ভাবিল—কবিতা লিখিয়া কাগজে ত ছাপাইয়াছি অনেক, একটু মৌখিক প্রয়োগ করিয়া দেখি না। তাই সে বলিল—“এখন আপনার দয়া। তরুতল আশ্রয় করতে গেলে লোকে বটগাছই তো খোঁজে!”

সুরেন্দ্রবাবু এ কথা শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ হইতেই সুরেন্দ্রবাবু এইরূপ মিষ্ট কথার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শেষে বলিলেন—“আমাকে বুঝি বটগাছ ঠাওরালে? আচ্ছা তুমি একটা

দরখাস্ত লিখে ফেল' দিকিন্, দেখি একবার চেষ্টাবেষ্টা করে। (কিয়ৎক্ষণ মুদিতনয়নে চিন্তা করিয়া) খালি একটা আছে! হাঁ, আছে, আছে।" বলিয়া দেরাজ হইতে একখানি শাদা কাগজ ও দোয়াত কলমটি সরোজের পানে সবাইয়া দিলেন।

সরোজ তাহার জ্ঞানমত একখানি দরখাস্ত লিখিয়া বড়বাবুকে দেখিতে দিল। তিনি সেখানি পড়িয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বাপ্‌রে বাপ্! করেছ' কি হে? এই কি দরখাস্তের ইংরিজি? দরখাস্ত লিখ্‌তে জান না? এ রকম করে' লেখে কা'রা? বড় বড় সাহেব বড় বড় সাহেবেদিগে এ ভাবে লেখে। বাঙ্গালীদের কি এ ভাবে লেখা শোভা পায়? বিশেষতঃ চাক্‌রী কর্‌তে এসে?"

সরোজ হতভম্ব হইয়া বড়বাবুর মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"নাও লেখ, পাঠ লেখ Most respected Sir, আর you গুলো সব কেটে লেখ Your Honour আর শেষে লেখ for which act of kindness I shall ever pray for Your Honour's long life, health, wealth, progeny and prosperity, ব্যস, তা' হলেই হবে, আর কোনও ভুল টুল্ নেই।"

সরোজ, অন্নচিন্তা প্রবল বলিয়া আর ব্যাকরণ বা

লিখনপদ্ধতির বিষয়ে কোন দ্বিধা না করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ ভাষায় একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিল।

চশ্‌মাজোড়াটি মুছিয়া, চাপ্‌কান ঝাড়িয়া, বড়বাবু দরখাস্তখানি হস্তে করিয়া সাহেব সন্দর্শনে গেলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সাহেবের খাস্‌কামরায় সরোজের ডাক পড়িল। তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। গোটাকয়েক ঢোক গিলিয়া, একটু কাসিয়া সাহেবের সম্মুখে আসিয়াই কবি আকব্বরীগজি এক সেলাম ঠুকিল। সাহেবের প্রতি প্রশ্নের উত্তরেই সরোজ Sir এবং Your Honour বলিল। সাহেব সরোজের বিনয় ও নম্র ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বড়বাবুকে বলিলেন

"Oh, I think he will do"--

সেই দিনই সরোজ মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনের এক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মেসে ফিরিল। মেসের বন্ধুগণ ভোজের হিসাব করিতে বসিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জননীর উপর সরোজের আর অভিমান রহিল না—তাঁহাকে খুব আহ্লাদ করিয়া সে এক পত্র লিখিল। কবিপ্রিয়াও প্রিয়ের পত্রে বঞ্চিত হইলেন না। বহুদিন হইতেই পত্নীকে কবিতায় পত্র লিখিবার সরোজের এক প্রবল সাধ ছিল; কিন্তু প্রবাসের অভাবে ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়া উঠে নাই,

কলিকাতা আসিয়া তাহার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু আজ আনন্দের আতিশয্যে আর কবিতা যোগাইল না বলিয়া পত্তময়ী গত্ত ভাষাতেই কায সারিল।

সরোজকান্ত চাকরী আরম্ভ করিল। এখন আর তাহার বিশৃঙ্খলতা নাই, আহারনিদ্রায় অনিয়ম নাই, আফিস যাওয়া আসাতেও ক্লান্তি বা বিরক্তি নাই! কবিসুলভ এলোমেলো কার্য্যকলাপগুলি একবারে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে যুক্ত, নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেল।

মেসে ও আফিসের জল-খাবারের ঘরে বাবুদের, কে কবে বড় সাহেবের খাস্ আর্দ্দালিকে ধমক দিয়াছেন, কার ড্রাফ্ট সাহেব না পরিবর্ত্তন করিয়া সহি করিয়াছিলেন, সেখানে অনুপস্থিত কোন্ বাবুকে কবে সাহেব গালি দিয়াছেন, প্রভৃতি বিষয়ের সদালোচনাতেও সরোজ ক্রমশ যোগ দিতে আরম্ভ করিল।

চাকরী হইয়া তাহার কবিতা রচনা ত কমিলই না—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াই গেল। সকল কাগজেই সে কবিতা পাঠাইতে লাগিল—ছাপাও হইতে লাগিল। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল, যদি কেহ বাজি রাখিয়া, কবি সরোজকান্তের কবিতা আছে বলিয়া বিখ্যাত অবিখ্যাত কোনও একটি মাসিকপত্র খুলিত, তবে তাহার বাজি হারিবার কোন আশঙ্কাই থাকিত না।

এক বৎসর কাটিয়া গেল—সরোজের পাঁচ টাকা বেতন

বৃদ্ধি হইয়া চল্লিশ হইল। এই অল্পদিনের মধ্যেই সরোজকে সাহেব একটু অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। কাযেই তাহার প্রতি বড়বাবুরও স্নেহ বৃদ্ধি হইল। অন্যান্য বাবুদের দরখাস্ত কৈফিয়ৎ প্রভৃতি লিখিয়া দিত বলিয়া তাহারাও সরোজকে খাতির করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া সে যে একজন কবি, মাসিকপত্রে তাহার রচনা ছাপা হয়, এজন্যও সরোজের প্রতি সকলের একটু সম্ভ্রমের ভাব দেখা যাইত। কোন কোন বাবু সওদাগরী আফিসের কায বন্ধ রাখিয়াও তাহার কাছে আসিয়া বসিতেন, কিছু কিছু কাব্যালোচনা করিতেন। মেজাজটা ভাল থাকিলে বড়বাবু বলিতেন—"দেখো সরোজ, লেজার বইয়ে যেন 'আমায় দে মা তবিল-দারী' লিখে ফেলো না।" বড়বাবু এই রসিকতাটুকুকে খুবই মূল্যবান্ মনে করিতেন। সে যাহাই হউক সরোজ ইহাতে বেশ খুসীই থাকিত, এবং হাসিমুখেই আফিসের কায করিত।

এক বৎসরকাল অজস্র ধারে "মেঘমল্লারে" স্থান পূরাই-বার কবিতা সরবরাহ করায় বর্ষশেষে কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সরোজকে কিছু পারিশ্রমিক দিলেন। বাড়ীতে মাসে মাসে পনের বিশ টাকা সাহায্য করিয়াও সরোজ নিজের কাছে কিছু জমাইয়াছিল। এইবার তাহার চিরজীবনের একটি সাধ পূর্ণ করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। সেটি গ্রন্থকার হওয়া। বন্ধুবর্গের মধ্যে যাঁহাদের মানবচরিত্র-জ্ঞান আছে,

তাঁহারা উৎসাহই দিলেন। যাহারা সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ —তাহারাই কেবল বই ছাপাইতে নিষেধ করিলেন; সরোজ তাঁহাদের সহিত মহাতর্ক জুড়িয়া দিল।

বন্ধু বলিলেন—"এই আক্রাগণ্ডার দিন, দুই দুইটি আবার মেয়ে আছে দলচ', কেন মিছিমিছি কতকগুলো টাকা বরবাদ করবে?"

সরোজ বলিল—"বই যদি বিক্রী হয়, তো টাকা উঠতে ক'দিন?"

বন্ধু বলিলেন—"বিক্রী হলে তো? একে তো এ দেশের লোকে বইই পড়ে না। যদি পড়ে' তো দু' একখানা চুটকি চাটকা উপন্যাস—তাও আবার চেয়ে ভিক্ষে করে। তোমার এ হচ্ছে কবিতার বই, ও তো কেউ চেয়ে পড়া দূরে থাক্—অমনি পেলেও পড়বে না।"

সরোজ রাগিয়া বলিল—"থাক্, ও কথায় আর কায নাই। বই আমি ছাপাবই।"

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপিত হইল যে, অমুক অমুক মাসিক পত্রের নিয়মিত লেখক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত সেনের অভিনব কাব্য "মোতির মালা"—এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার। ভাবে ও ভাষায় অতুল্য, কাব্যে ও কল্পনায় অমূল্য, বঙ্গসাহিত্যের অভিনব সম্পদ। গ্রন্থকারের চিত্রশোভিত—মূল্য এক টাকা।

সরোজের ধারণা বইয়ের কাট্‌তি বিজ্ঞাপনের বাহুল্য

ও আড়ম্বরের উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া যাহার কবিতা এত লোকে ভালবাসে—তাহার কবিতাগ্রন্থ তো লোকে কিনিবার জন্য উৎসুক হইয়াই বসিয়া আছে।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর হইতেই সরোজ ভাবিতে লাগিল যে, হয়ত গুরুদাস বাবুর দোকানে শত শত অর্ডার আসিয়া জমিয়াছে। প্রেস শীঘ্র ছাপিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার মনে বড়ই অশান্তি উপস্থিত হইল। সকাল-সন্ধ্যা কবি স্বয়ং প্রেসে গিয়া ধর্ণা দেওয়া আরম্ভ করিল। যে যে ফর্ম্মা ছাপা হইল—সেই সেই ফাইলগুলি কবির পকেটে পকেটেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত, অপরিচিত যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই ফাইলগুলি দেখাইয়া জানাইল যে অচিরে একখণ্ড "মোতির মালা" তাঁহার হস্তগত হইবেই হইবে।

"মোতির মালা" ছাপা হইয়া যেমন প্রস্তুত হইল অমনি অপরিসীম আনন্দে ও উৎসবে একটি ঝাঁকামুটের মাথায় একশতখানি পুস্তক চাপাইয়া দোকানে দোকানে দিবার জন্য সরোজ বাহির হইল।

ভাদ্র মাস। বৃষ্টির নামগন্ধ নাই, বিষম গুমোট। বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সরোজ মাত্র ২৫ খানি বই গছাইতে পারিল। স্থানাভাব জন্য প্রায় সকল পুস্তক-বিক্রেতাই পুস্তক রাখিতে অস্বীকার করিল। কেহ কেহ বই তো রাখিলই না, অধিকন্তু তাহাকে খুন্-

খারাবী জালজুয়াচুরিওয়ালা একখানা রগ্‌রগে গোছের ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস লিখিতে উপদেশ দিল।

রাত্রি ৮ টার সময়ে ৭৫ খানি বহি লইয়া মুখখানি মলিন করিয়া কবি মেসে ফিরিলেন। মুটিয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে চুক্তির দ্বিগুণ পারিশ্রমিকেও অসন্তুষ্ট হইয়া নিষ্ক্রমণ করিল।

তথাপি সরোজ দমিল না। ভাবিল যখন কাগজে কাগজে উচ্চ সমালোচনা হইবে, নানা পদস্থব্যক্তির অভিমত সম্বলিত-বিজ্ঞাপন বাহির হইবে—তখন এই প্রত্যাখ্যান-কারী মূঢ় পুস্তকবিক্রেতার দল উপযাচক হইয়া পুস্তক লইতে আসিবে, সেই সময়ে এ অপমানের প্রতিশোধ সে লইবে। বই দিতে চাহিবে না—অনেক কাকুতিমিনতির পরে তবে দিবে, তাও অত্যন্ত অল্প কমিশনে।

সেই রাত্রি হইতেই প্রায় দশদিনকাল পর্যান্ত সরোজ বাঙ্গলার সমস্ত মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে "সমা-লোচনার্থ" প্রায় ১০০ কপি "মোতির মালা" পাঠাইল। প্রায় দুইশত খণ্ড পুস্তক "বন্ধুবরেষু" হইল। মেসের ও আফিসের বন্ধুবর্গ কেহই এক একখানি "মোতির মালা" লাভে বঞ্চিত রহিলেন না।

বাসায় নীচের তলে একটা অব্যবহার্য্য স্যাঁৎসেঁতে খালি-ঘর পড়িয়া ছিল। মেস্‌বাসিগণের অনুমতিক্রমে, সাড়ে তিন টাকায় একখানি তক্তাপোষ কিনিয়া সরোজ সেই ঘরে বাকী সাতশত পুস্তক সাজাইয়া রাখিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল।

প্রথম প্রথম সরোজ পুস্তকবিক্রেতাদিগের নিকট এত ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল যে, তাহারা অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিল। এবম্বিধ তাহাদের দৌরাত্ম্যে কেহ কেহ শতকরা বিশ টাকা কমিশনের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও বই ফেরৎ দিতে চাহিল। সেই জন্য সরোজ আর বড় সেদিকে যায় না—কি জানি যদি আবার বহি ফেরৎ দিতেই চাহে।

পূজার হিসাবে জানা গেল সর্ব্বসাকুল্যে মাত্র দুইখানি পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। এতদিনে সরোজ যথার্থই আশাভঙ্গ হইল। পাঠকসম্প্রদায়ের এই কাব্যরসজ্ঞতার অভাবে এবং নিদারুণ মূর্খতার দরুণ সরোজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটার উপরেই একেবারে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। তাহার প্রধান আপশোষ "বাঙ্গালী আমায় চিন্‌লে না! বাঙ্গালা দেশে জন্মেছি বলেই আমার আদর হলো না।"

এদিকে সমালোচনার্থ যে সকল মাসিকপত্রে পুস্তক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই "মোতির মালা"র উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিল। সে সকল সমালোচনা পড়িয়া সরোজকান্তের বুক দশ হাত হইল।

আষাঢ়ের নব মেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সরোজের আবার

কাব্য প্রকাশের উৎকট অভিলাষ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু অর্থাভাবে এবার আর সে বাসনা ততটা প্রবল হইবার সুবিধা পাইল না। তথাপি সে ভাবিল—হাজার না ছাপাইয়া বরং পাঁচশো কপি বহি ছাপা যাউক। এমন দিনে ইয়ুরোপে মহাসমর বাধিয়া গেল।

ব্যবসায়ে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। জাহাজ আর আসে না। কাগজ যাহা দেশে মজুত ছিল—তাহা অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিল। বাঙ্গলা-সাহিত্যের সম্পদ বাড়াইতে কাগজের রীম দ্বিগুণ দরেও হু হু করিয়া কাটতি হইয়া গেল। পূর্ব্বকাব্যের গতি নিরীক্ষণ করিয়া সরোজ পিছাইল। এতদ্বারা বাঙ্গলা-সাহিত্যের লাভ হইল কি লোকসান্ হইল, তাহা সমালোচকগণই ভাল বলিতে পারেন।

সরকারী ও বেসরকারী আফিসের কর্ম্মচারী এবং সমগ্র ভারতের অধিবাসিগণ সাধ্যমত যখন যুদ্ধভাণ্ডারে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, সরোজও তখন পাঁচ টাকা চাঁদা সহি করিল। সরোজ পূর্ব্বে কখনও সংবাদপত্র পড়িত না, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি সে সংবাদপত্রের একজন একান্ত অনুরক্ত পাঠক হইয়া পড়িল। তাহার তখন একমাত্র চিন্তা—বোধ হয় সাম্রাজ্যাধিপতি যুদ্ধলিপ্ত সম্রাটের অপেক্ষাও প্রবল চিন্তা—এ যুদ্ধ কবে শেষ হয়। কারণ শেষ না হইলে আর কাগজ দেশে আসিতে পারিতেছে না।

নানা দেশের রাজা মহারাজা ধনী বণিকগণ শিবিরোপযোগী সামগ্রীসম্ভার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। নারীরা আহত সৈনিকবর্গের জন্য ব্যাণ্ডেজ, যোদ্ধাদের জন্য পায়জামা, তোয়ালে প্রভৃতি আবশ্যকীয় বস্তুগুলি নিজে তৈরি করিয়া পাঠাইতেছেন। ধনিগণ কেহ সিগারেট; কেহ দেশলাই, কেহ খাদ্য পাঠাইয়া চরিতার্থ হইতেছে। সরোজ বলিল, যে তাহার ইচ্ছা সেও তাহার হাতের নির্ম্মিত কোনও জিনিষ পাঠায়।

কালীবাবু বলিলেন—"তুমি তোমার বইগুলি পাঠাও, আর কি পাঠাবে?" সকলে হাসিয়াই আকুল। কবি বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া সরোজ এই কথায় মনে মনে হাসিতেছিল। হঠাৎ সে এক ফন্দি ঠাওরাইল। কাহাকেও কিছু বলিল না বা কাহারও নিকট কোন পরামর্শও চাহিল না।

পরদিন আফিসে বড় সাহেবকে গিয়া সরোজ জানাইল যে সে একজন গ্রন্থকার, কবি হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার নামও কিছু আছে। সে এই যুদ্ধে আরও কিছু সাহায্য করিতে চাহে। তাহার অবিক্রীত প্রায় ৭০০ কপি কাব্যগ্রন্থ সে যুদ্ধের জন্য দান করিতে প্রস্তুত।

সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একটু হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা ত বাঙ্গালা জানে না—তোমার বই তারা পড়িতে পারবে না।"

সরোজ একটু সলজ্জভাবে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল—"বই যাবে না, যাবে টাকাই। যদি সাহেবের Honour এদিকে একটু নেকনজর দেন্ তো—"

সাহেব বাধা দিয়া উল্লসিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"টাকা? টাকা কি করে হবে?"

সরোজ সবিনয়ে নিবেদন করিল—"হুজুর যদি হুকুম দেন তো আমাদের আফিসের সকলেই এক এক খানি করে বই কিনিতে বাধ্য হবে। এ আফিসে যা বিক্রী হবার হবে, বাকীগুলি যদি হুজুর অন্য হাউসের বড় সাহেবদের বলে তাঁদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে চালিয়ে দেন—তা হ'লে আর বিক্রী হ'তে কতক্ষণ? এক টাকা দাম বইতো নয়—তা সবাই দিতে পারবে, বিশেষ, এমন সৎকার্য্যের জন্য। তার উপর আবার বড় সাহেবের হুকুম।"

সাহেবের মুখ খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সোল্লাসে টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—"অতি চমৎকার কথা! এ আমি নিশ্চয়ই করবো। Capital idea, I must do it।"

বড়বাবুর ডাক পাড়িল। সাহেব বড়বাবুকে আদেশ দিলেন যে—এ মাসের বেতন বিলির সময় প্রত্যেক কর্ম্ম-চারীই যেন একটাকা দিয়া সরোজের বহি একখানি কেনে—এ টাকা ওয়ার রিলীফ্ ফণ্ডে যাইবে। কোনও কর্ম্মচারী যদি কিনিতে আপত্তি করে, তবে তাহার নাম যেন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ জানান হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যে যে দোকানে "মোতিরমালা" ছিল, সরোজ কয়দিন যাবৎ তত্তৎ দোকান ঘুরিয়া, দোকানদারদিগকে আশাতীত রূপে বিস্মিত করিয়া দিয়া বইগুলি ফেরৎ আনিয়া বাসায় রাখিয়াছিল। ফেরৎ আনিবার সময় সরোজ তাহাদিগকে ইচ্ছা করিয়াই দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া ও চড়া মেজাজ দেখাইয়া আত্মতৃপ্তির সুযোগ ছাড়ে নাই। দোকানদারগণ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসকারদের এরূপ রক্তচক্ষু মধ্যে মধ্যে দেখিতে পায়, কিন্তু কবিতাগ্রন্থের লেখক যে উক্তরূপে জোর করিয়া বই ফিরাইয়া লইয়া যায়—ইহা তাহাদের নিকট একেবারে স্বপ্নাতীত নূতন বলিয়াই অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিল।

যথাসময়ে বেতন বাঁটিবার দিন আসিল। আফিসে অন্য কোনও বাবুর আসিবার আগে হইতেই সরোজ তাহার কাব্যগ্রন্থগুলি আনাইয়া বড়বাবুর টেবিলের নিকট স্তূপীকৃত করিল। সাতশো "মোতির মালা"য় ঘরে 'ন স্থানং তিল ধারণং'।

সাহেবও সেদিন অপেক্ষাকৃত সকালেই আফিসে পদার্পণ করিলেন। সরোজ বারান্দাতেই ঘুরিতেছিল। সাহেব যেমন গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন, অমনি তাঁহাকে ধরণী-সমান্তরাল-মেরুদণ্ডে সরোজ এক সেলাম দিল। সাহেব কবির পৃষ্ঠ চাপ্‌ড়াইয়া শুভ-প্রভাতের প্রতিদান দিলেন।

আফিসের সব বাবুই একখণ্ড করিয়া "মোতির মালা" ক্রয় করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এতদিন যে সরোজকে সকলে সাধারণ মনুষ্যস্তর হইতে একটা উচ্চতর জীব বলিয়া প্রশংসা করিতেন এবং "মোতির মালা" উপহার পাইয়া যে কাব্যের শতমুখে গুণগান করিয়াছেন—আজ তাঁহারাই সেই কাব্যের উপরে আচম্বিতে কেমন যেন বিরূপ হইয়া পড়িলেন। ক্রেতাদের মুখ অকস্মাৎ ম্লান হইয়া গেল।

বৃদ্ধ খাজাঞ্চিবাবুর মুখটিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অপ্রসন্ন, কারণ তাঁহাকে কোন্ আফিসে কত বই পাঠাইতে হইবে, কোথা হইতে কত টাকা আসিল, কত বাকী, প্রভৃতির হিসাবের জন্য আর একটি নূতন বহি খুলিতে হইল। কায বাড়িল—কিন্তু দুপয়সা পাইবারও কোন আশা নাই।

এদিকে সপ্তাহকাল হইতে প্রায় প্রত্যহই দেখা যাইতেছে যে বেলা পাঁচটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আফিস ফেরতা অধিকাংশ বাবুই এক একখণ্ড "মোতির মালা" হস্তে গৃহে ফিরিতেছে।

অচিরেই কলিকাতা সহরে গুজব উঠিয়া গেল "মোতির মালা" নামক একখানি কবিতাগ্রন্থের আজকাল খুব চল্‌তি। গ্রন্থকারগণ, ক্রমশ পুস্তকবিক্রেতাগণও এই ধারণার বশবর্ত্তী হইলেন। নবস্থাপিত পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক "দত্ত কোম্পানী" আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—

তাঁহারা খোঁজখবর করিয়া জানিলেন যে "মোতির মালা" প্রণেতা কবি সরোজ কান্ত ১৮নং বেণেটোলা লেনে মেসের বাসায় বাস করেন।

পরদিন স্বয়ং দত্ত মহাশয় বেণেটোলায় কবিসন্দর্শনে আসিলেন। নানা কথাপ্রসঙ্গে ও কবির সুখ্যাতির সূত্রে তিনি তাঁহাদের ব্যয়ে সরোজের একখানি কাব্য প্রকাশের আগ্রহ জ্ঞাপন করিলেন। সরোজ মনে মনে হাসিয়া অনেক অনিচ্ছার ভান দেখাইয়া শেষে স্বীকার করিল। তিনদিনের মধ্যেই কাপি পাইবার প্রতিশ্রুতি লইয়া দত্ত মহাশয় বিজয়-উল্লাসে বিদায় লইলেন।

একমাসের মধ্যেই কাব্য বাহির হইল। নাম— "উপচার", মূল্য এক টাকা। বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার জন্য প্রকাশকদের নিকট হইতে মাত্র পঞ্চাশখানি পুস্তক সরোজ পাইল; সেগুলি যথারীতি "বন্ধুবরেষু" হইল।

ছয় মাস কাটিয়া গেল। কিন্তু তিনখানির বেশী "উপচার" বিক্রয় হইল না দেখিয়া দত্ত মহাশয় অত্যন্ত দমিয়া গেলেন।

আবার একদিন দত্ত মহাশয় বেণেটোলার বাসায় উপস্থিত। মুখখানি তাঁহার আজ অত্যন্ত ম্লান, নিতান্ত বিপন্নের মত দেখাইতেছিল। তিনি প্রস্তাব করিলেন, খরচ উঠিয়া গেলে লভ্যাংশের শতকরা ত্রিশ টাকা তিনি পাইবেন বাকী টাকা গ্রন্থকার পাইবেন, এই মর্ম্মে যে চুক্তি-

পত্র হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি শতকরা পনেরো টাকা মাত্র লইতে প্রস্তুত—যদি সরোজ প্রকাশ-ব্যয়ের অর্দ্ধেক টাকাটা এখন তাঁহাকে নগদ দেয়। তাঁহাদের নূতন কারবার, এত টাকা লোকসানে সর্ব্বনাশ হইতে পারে প্রভৃতি অজুহাত দেখাইয়া বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় কবির করুণার উদ্রেক করিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। আজ আর সরোজ হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে টাকা দিতে তো স্বীকৃত হইলই না, বরং শাণিত বিদ্রূপের বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। দত্ত মহাশয় নিজ মান নিজের কাছে বিবেচনা করিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেলেন।

* * * *

সরোজের এই মহনীয় রাজভক্তি ও সর্ব্বানুকরণীয় ত্যাগ-স্বীকারের বার্ত্তা বর্ণনা করিয়া সাহেব বিলাতের বড় আফিসে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আফিসে এবং সরোজকেও স্বতন্ত্র এক পত্র দিয়াছেন। সরোজের একশত টাকা বেতনে পদোন্নতি হইল।

সরোজ এখন মেস ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া “ফ্যামিলি” লইয়া আসিয়াছে। জননী বাড়ীতে আছেন।

মাহিনাবৃদ্ধির প্রীতিভোজে নানা বাক্যালাপের মধ্যে

জনৈক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ সরোজ বাবুর পদ্যটদ্য আর কাগজে দেখি না যে? লেখা ছেড়ে দিলেন নাকি?"

সরোজ হাঃ হাঃ করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—"নাঃ, সে সব ব্যারাম ভাল হ'য়ে গেছে। আমার বিশ্বাস ম্যালেরিয়ায় দেশের যতটা না ক্ষতি হয়েছে, তার বেশী অনিষ্ট করেচে ঐ মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা।"

সম্পাদকের পূর্ব্বে সরোজ সম্পূর্ণ অমূলক নিশের আত্মীয়তা সূচক একটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল; আমরা বাহুল্যভয়ে সেটি আর লিপিবদ্ধ করিলাম না।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থাবলী-প্রকাশিত

গল্প-পুস্তক।

১। অর্ঘ্য—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। নেপালচন্দ্রের ঘটকালী—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

৩। গল্পমাল্য—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।